লাইসেন্স

সাদাত হাসান মান্টো

লাইসেন্স

সাদাত হাসান মান্টো

অনুবাদ ও সম্পাদনা :

সমীর কুমার দাস

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection

বইটি সাবধানতা এবং যত্নতার
সাথে ব্যবহার করুন।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

পরিবেশক :

নবোদয় প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশ কাল ঃ
মে, ১৯৮৪ ইং

প্রকাশনায় ঃ
সেলিনা আকতার সেলু
সদরঘাট
চট্টগ্রাম ।।

প্রচ্ছদ ঃ
সুখেন দাস

মুদ্রণে ঃ
মাসুম আর্ট প্রেস
নবাববাড়ি
ঢাকা—১ ।।

মূল্য ঃ সাদা—১৫·০০ টাকা
নিউজ—১০·০০ টাকা

প্রসঙ্গ কথা

উর্দু সাহিত্যে যে ক'জন হাতে গোনা প্রখ্যাত লেখক আছেন তাদের মধ্যে সাদাত হাসান মান্টো একটি নাম একটি ইতিহাস একটি বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। ১৯৫২ সালে কালো সালোয়ার গল্প লেখার জন্য অশ্লীলতার অভিযোগে পাকিস্তানের আদালত কতৃক অভিযুক্ত হন এবং ২৫ টাকা দণ্ড প্রদান করেন। ঐ অভিযোগ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে মান্টো আক্ষেপ করে বলেছিলেন "হে খোদা হে রাব্বুল আলামীন তুমি সাদাত হাসান মান্টোকে এ পৃথিবী থেকে তুলে নাও। সূর্যের আলোর মধ্যে চোখ খোলে না, কিন্তু রাতের অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। লজ্জার আবরনীর প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই, সে দেখে মানুষের নগ্নতা। আপন স্ত্রীর প্রতি সে চোখ তুলেও দেখে না, কিন্তু বারবনিতা বাঈজীদের সাথে মন খুলে কথা বলে। যেখানে দুঃখ পাওয়া উচিত কাঁদা উচিত সেখানে সে হাসে, যেখানে আনন্দ পাওয়া উচিত সেখানে সে কাঁদে। কয়লার দালালী করে যারা নিজের মুখ কালিমালিপ্ত করে সে তাদের কালিমা দূর করে স্বচ্ছ চেহারা সবাইকে দেখায়। এ ধরনের দুবৃত্ত অসৎ ব্যক্তিকে তুমি তুলে নাও কারণ সে এ দুনিয়ার দুষ্কৃতিকারী অপ্রিয়ভাজনদের আমলনামার কালিমা মুছে ফেলার দায়িত্ব নিয়েছে।"

উপরোক্ত বক্তৃতাংশ হতে মান্টোর সাহিত্যের উপজিব্য সম্বন্ধে আঁচ করা যায়। মান্টো যতো গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস নাটক রচনা করেছেন তাতে তিনি সমাজের অবহেলিত সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন

মান্টো সাধারণ গরীব মেহনতী মানুষ শ্রমিক, কৃষক, কামার, কুমোর, জোলা এমন কি সমাজের অবহেলিত নির্জাতীত বেশ্যাদের নিয়েও তার সাহিত্য রচনা করেছেন। তাদের দুর্দশা নিয়ে সংগ্রাম করেছেন এবং এই সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনি বহুবার রাজদণ্ড ভোগ করেছেন, নিগৃহিত হয়েছেন।

আর সমাজের এই নিগৃহিত শ্রেনীর দুঃখ দুর্দশায় ভুলে থাকার জন্য তিনি একসময় মদ ধরে ছিলেন এবং এই মদই তার জীবনের কাল হয়েছিল সাদাত হাসান মাণ্টোর জীবনের শেষ দিনগুলো খুব তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। দেখতে না দেখতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে চলে গেলেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি যে সমস্ত রচনা করেন তা অত্যন্ত স্বল্প মুল্যে বিক্রি করে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে চলে যেতেন পান শালায় এবং সমস্ত খরচ করে ফিরে আসতেন। মানব জীবনের দুঃখ দুর্দশার কথা চিন্তা করে তিনি খুব অস্থিরতা বোধ করতেন—ভুলে যাওয়ার জন্য মদ পান করতেন।

স্পষ্টভাষী লেখক মাণ্টো সমাজের মিথ্যা আবরণ ও ভনিতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে চান। তাঁর গল্প ও প্রবন্ধে মানবতার অপমানকারিদের ভদ্র ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। মাণ্টো মানববাদী লেখক। সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট। গল্প লেখক ও অশ্লীলতা শীর্ষক প্রবন্ধে মাণ্টো বলেছেন, "বিশ্বের সব দুর্গতি ও দুর্ভোগের মুল কারণ ক্ষুধা। ক্ষুধা মানুষকে ভিক্ষা করতে বাধ্য করে। অপরাধের দিকে ধাবিত করে। ক্ষুধা চরমপন্থি হওয়ার শিক্ষা দেয়। ক্ষুধা নারীকে সতিত্ব বিক্রি করতে বাধ্য করে। ক্ষুধার জ্বালা ভীষণ জ্বালা। এর আঘাত মারাত্মক। ক্ষুধা মানুষকে পাগল করে তোলে কিন্তু পাগলামী ক্ষুধার সৃষ্টি করে না।। মাণ্টো এই ক্ষুধা সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে বিশ্বপ্রেমিক হয়ে ওঠেন। তখন বিশ্বে ক্ষুধার বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম সৃষ্টি হয়। সারা বিশ্বে প্রগতিশীলরা 'সবার জন্য খাদ্য'' এই আন্দোলন সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনই পরবর্তিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে পরিনত হয়। মাণ্টো এই আন্দোলন দ্বারা যথেষ্ট উৎসাহিত হন এবং সেই সময়ের গল্প প্রবন্ধের মাধ্যমে তার প্রকাশ দেখা যায়। এই সময়ে তিনি ফরাসী, ইংরেজী ও রুশ সাহিত্যের মোঁপাশা, সামার সেট মম এবং ম্যাকসিম গোর্কির রচনা পড়ে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

মানুষ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও পর্যালোচনার পর মাণ্টো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মানুষ কখনও পাপ নিয়ে জন্মায় না। ভাল

মন্দ পরে বাইরে থেকে তার মনে কল্পনায় প্রবিষ্ট হয়। কেউ এই পাপকে সযত্নে প্রতিপালন করে থাকেন। অবশ্য সকলে তা করেন না। তাঁর বক্তব্য হল বাল্যকালে মানুষ নিষ্পাপ ও সৎ থাকে। পারিপার্শ্বিকতা পরে মানুষকে বিপথগামী হতে বাধ্য করে। মাণ্টো সচক্ষে যা দেখেছেন বিনা দ্বিধায় সুস্পষ্ট ভাষায় তা পাঠকদের কাছে পেশ করেছেন। কারণ তিনি ছিলেন বাস্তবধর্মী লেখক। তাই ঐ দৃষ্টিভঙ্গিতে মানব জীবনকে তিনি উপলব্ধি করাতে চেষ্টা করেন। মাণ্টো কোন বিশেষ আদর্শকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি, তাই অনেকে তার সমালোচনা করেছেন।

যখন মাণ্টো অন্ধকার গলির পতিতালয়ের সুগন্ধি, সুলতানা, যুগীয়া বাবু গোপীনাথ প্রভৃতি চরিত্রকে প্রকাশ্য রাস্তায় নিয়ে আসেন, তখন সমাজ এইসব চরিত্রহীন ভ্রষ্টাদের বরদাস্ত করতে পারে না। ফলে মাণ্টোর লেখাকে অশ্লীল বলে আখ্যায়িত করা হয়। অনেকে তাঁকে অকথ্য ভাষায় তীরস্কার করেছেন কিন্তু এই বিরূপ সমালোচনার মাঝে একটি আওয়াজ সর্বদা ধ্বনিত হয়েছে—মাণ্টো একজন খ্যাতনামা শক্তিধর উর্দূ লেখক। তা ছাড়া মাণ্টোর গল্পের ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল।

মাণ্টোর এই সহজ সরল ভাষা এবং মানবতার প্রতি দরদ বোধ প্রকাশ পেয়েছে "লাইসেন্স" বইটির নাম গল্প লাইসেন্সে। এখানে সমাজের উপর তলার ব্যক্তিরা যারা সমাজের নানাবিধ কার্য পরিচালনা করেণ তাদের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে লাইসেন্স গল্পের নায়িকা নীতিকে গনিকালয়ে স্থান লাভ করতে হয়েছিল। নীতি তার কোচয়ান স্বামীর মৃত্যুর পর বাচার জন্য তার স্বামীর ঘোড়া গাড়ী ভাড়ায় দিয়েছিল কিন্তু যারা গাড়ী ভাড়া নেয় তারা ভাড়া দেওয়ার পরিবর্তে নীতির যৌবন উপভোগ করার জন্য বেশী হাত বাড়ায়। কিন্তু নীতি তার পরলোকগত স্বামীর স্মৃতি বহন করে সৎভাবে বাঁচতে চায়। আর তাই সে নিজেই ঘোড়ার গাড়ী চালনার দায়িত্ব নেয়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তারা মেয়ে মানুষের এটা অনাসৃষ্টি কাণ্ড মনে করে এবং তার লাইসেন্স কেড়ে নেয়। পরিবর্তে তাকে গনিকালয়ের লাইসেন্স দেয়। সমাজে আজও এভাবে নারী নির্যাতন চলছে। তাই উর্দূ সাহিত্যের "নীতি" বাংলাদেশের নির্যাতীত নারী

সমাজের সাথে একাত্ম হয়ে যায়।

মাটি ও মানুষকে ভালবেসে যেসব কবি সাহিত্যিক লেখনী ধারণ করেন, মৃত্যুর পরও মানুষ তাদের ভুলতে পারে না। উর্দু সাহিত্যের বিস্ময়কর প্রতিভা সাদত হাসান মান্টোকেও লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকা ভুলতে পারেনি। কোনদিন পারবেও না। তাঁর গল্প লেখার কৌশল, বর্ণনায় সাবলীলতা, চরিত্র সৃষ্টির নৈপুন্যতা হেতু প্রতিটি গল্প পাঠ করেই মনে হয় পাঠক তার নিজস্ব পরিবেশের নৈকট্য লাভ করছে. সাধারণ মানুষের তথা সমাজের ৯৫ ভাগ মানুষের দুঃখ দুর্দশার সাথে একাত্মতা বোধ করছে। মান্টোর গল্প, প্রবন্ধ পড়ে তাই পাঠকদের অনেকে সমাজের ঐ সমস্ত অত্যাচারী নীচদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে সমাজ সচেতন, নির্জাতীতদের দুঃখ দুর্দশা দুর করার জন্য সংগ্রামী হন। অবশেষে লাইসেন্স বইটির অনুবাদ পাঠকদের ভাল লাগলে আনন্দিত হব।

—সমীর কুমার দাস

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

সাদাত হাসান মান্টোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জন্ম : ১১ই মে ১৯১২ সাল। জন্মস্থান : সোমরালা, জিলা-লুধিয়ানা, পাঞ্জাব। স্ত্রীর নাম : সুফিয়া। তিন কন্যা : নিগাত, নজহাত ও নুসরাত।

শিক্ষা : অমৃতসর, আলীগড়।

বসবাস : অমৃতসর, আলীগড়, দিল্লী, বোম্বে ও লাহোর।

মৃত্যু : ১৮ই জানুয়ারী ১৯৫৫, লাহোর।

প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা

প্রথম প্রকাশিত গল্প —তামাসা

প্রথম গ্রন্থ : মান্টো কে আফসানে ১৯৩৮ সাল।

গল্প : (১) মান্টো কে আফসানে (২ চুগদ (৩) এজিদ (৪) নমরুদ কি খোদাই (৫) থালি বোতল খালি ডিবেব। (৬) সড়ক কে কিনারে (৭) বাদশাহাতকা খাতমা (৮) সরকান্দো কে পিঁছে (৯) বোরকে (১০ করওয়াট (১১) নুরজাহান সরওজান (১২) ধোঁয়া (১৩) লজুতে সং (১৪) ঠাণ্ডা গোস্ত (১৫) লাইসেন্স (১৬ টোবা টেকসিং (১৭) হেরে চলে গেল (১৮) শাহদ্দৌলার ইঁদুর (১৯) স্বরাজের জন্য।

প্রবন্ধ : (১) মান্টোকে মজামিন (২) তলখ তুরশ শিরী (৩) উপর নীচে আউর দরমিয়ান।

অনুবাদ : (১) বেয়ারে (অস্কার ওয়াইল্ড) (২) কয়েদির ডাইরী (ভিক্টর হুগো) (৩) গোর্কির গল্প।

উপন্যাস : কোয়ের গুনওয়ানকে।

।। লাইসেন্স ।।

অব্বু কোচোয়ান ছিল খুব সুপুরুষ। তার টাঙ্গার ঘোড়াও ছিল শহরের এক নম্বর ঘোড়া। যে-সে সওয়ারি সে কখনও নিত না। বাঁধা ধরা খদ্দের ছিল। এই বাঁধাধরা খদ্দেরের কাছ থেকে দিনে দশ-পনেরো টাকা পেলেই অব্বুর কাছে যথেষ্ট ছিল। অন্যান্য কোচোয়ানদের মতো নেশা ভাঙ সে করত না। সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পড়ে সেজে-গুজে থাকা সে খুব পছন্দ করত।

তার টাঙ্গা যখন ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে রাস্তা দিয়ে চলে যেত তখন আপনা-আপনি সবার চোখ তার টাঙ্গার ওপর গিয়ে পড়ত। "ঐ-যে ফুলবাবু অব্বু যাচ্ছে। দেখ কেমন ডাঁট নিয়ে বসে আছে। পাগড়িটা দেখ, কেমন তেরচা করে বেঁধেছে।"

লোকের চোখের এই ভাষা যখন অব্বু শুনত তখন তার ঘাড় এক আভিজাত্য বোধে ফুলে উঠত এবং তার ঘোড়ার চাল আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। ঘোড়ার লাগাম অব্বুর হাতে এমন কায়দায় ধরা থাকত, যেন তা ধরায় কোন প্রয়োজনই নেই। মনে হত, ঘোড়া যেন বিনা-ইশারায় চলেছে। তার মালিকের হুকুমের কোন প্রয়োজন নেই। কখনও কখনও এমন মনে হত, অব্বু আর তার ঘোড়া চুন্নী যেন অভিন্ন। যেন পুরো টাঙ্গাটাই একটি জীবন। আর এই জীবন অব্বু ছাড়া আর কে হতে পারে।

যে সব সওয়ারিদের অব্বু নিতে অস্বীকার করত তারা মনে মনে অব্বুকে গাল দিল। কেউ কেউ আবার অভিশাপও দিত,—"ভগবান যেন এর অহংকার নষ্ট নয়, টাঙ্গা ঘোড়া যেন নদীতে পড়ে।"

অব্বুর ঠোঁটের ওপর যে হাল্কা-হাল্কা গোঁফের রেখা ছিল, তাতে আত্মবিশ্বাসের এক মিষ্টিহাসি লেগে থাকত। তাকে দেখে কোনা কোন কোচোয়ান জ্বলে-পুড়ে মরত। অব্বুর দেখাদেখি কয়েকজন কোচোয়ান এদিক-ওদিক থেকে ধার-দেনা করে টাঙ্গা বানাল। টাঙ্গাটা

পিতলের সাজ দিয়ে সাজাল। কিন্তু তবু তাদের টাঙ্গা অববুর সাজ-বাটের কাছে দাঁড়াতে পারল না। তাদের টাঙ্গা ঘোড়ার চেয়ে অববুর টাঙ্গা-ঘোড়াকে লোকে বেশী পছন্দ করত।

একদিন দুপুরে অববু এক গাছের ছায়ায় তার ঘোড়াকে বেঁধে টাঙ্গার ওপর বসে একটু ঝিমুচ্ছিল, এমন সময় একটি শব্দ তার কানের কাছে গুনগুন করে উঠল। অববু চোখ মেলে তাকাল। দেখল একজন মহিলা টাঙ্গার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অববু এক ঝলক তাকে দেখে নিল। সেই মহিলার উচ্চারিত যৌবন তার হৃদয়কে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। সে মহিলা ছিল না, ছিল ষোল সতেরো বৎসরের তরুণী। ছিপছিপে কিন্তু সুগঠন। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কানে রূপোর ছোট ছোট দুল। সোজা সিঁথি। তীক্ষ্ণ নাক। আর নাকের ডগায় উজ্জ্বল তিল। পরনে লম্বা কামিজ আর নীল রঙের গারারা। মাথায় ওড়না।

মেয়েটি তারুণ্যের কণ্ঠে অববুকে জিজ্ঞেস করল, "এই স্টেশন যেতে কত নেবে ?"

অববুর ঠোঁটের মুচকি হাসি এক নিমিষে দুষ্টুমি হাসিতে পাল্টে গেল। বলল, "কিচ্ছু লাগবে না।"

মেয়েটির শ্যামবর্ণ মুখের ওপর লালিমা ছেয়ে গেল,—"কত নেবে স্টেশন যেতে ?"

অববু চোখ দিয়ে তাকে অবগাহন করতে করতে বলল, "তোর কাছ থেকে আমি কি নেব রে। চলে আয়—টাঙ্গাতে বস।"

মেয়েটি সন্ত্রস্ত হয়ে তার দুটি সুডৌল বুকের ওপর রেখে যতটুকু সম্ভব ঢাকার চেষ্টা করল। "তুমি কেমন ধরনের কথা বল ?"

অববু হেসে বলল, "আয়, উঠে বস। তুই যা দিবি তাই নিয়ে নেব।"

মেয়েটি একটু চিন্তা করল। তারপর পাদানিতে পা দিয়ে টাঙ্গাতে উঠে বসল। বসে বলল, "জলদি স্টেশনে নিয়ে চল।"

অববু পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, "তোর খুব জলদি আছে তাই না !"

—"হায়, হায়, তু...' মেয়েটি আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

টাঙ্গা ছুটতে লাগল ছুটতেই লাগল। মেয়েটি ঘোড়ার খুড়ের নীচ দিয়ে কয়েকটি রাস্তা ছুটে পার হয়ে গেল। মেয়েটি লজ্জায় জড়সড় হয়ে বসে রইল। অববু ঠোঁটে দুষ্ট দুষ্ট হাসি ঝিলিক দিচ্ছিল। বেশ দেরী হয়ে যাচ্ছিল বলে মেয়েটি ভয়ার্ত কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করল, "এখনও স্টেশন আসেনি?"

অববু বেপোয়া ভাবে উত্তর দিল, "এসে যাবে। তোর আমার স্টেশন তো একই।"

—"মানে?"

অববু, পেছন ফিরে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই কি এইটুকু বুঝিস না, তোর আমার স্টেশন একই? অববু যখন তোকে দেখেছে তখনই এক হয়ে গিয়েছে। তোর জানের কসম, তোর গোলাম ঝুট বলছে না।"

মেয়েটি তার মাথার ওড়না টেনে দিল। ওর চোখই ওকে বলে দিচ্ছিল অববু কী বলতে চায় তা ও বুঝে ফেলেছে। আর তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল অববুর কথায় সে একটুকুও ক্ষুন্ন হয়নি। কিন্তু তার দ্বিধা ছিল দু'জনের স্টেশন এক হোক আর না হোক অববু তো সুন্দর। কিন্তু বিশ্বাযোগ্য হবে তো। স্টেশনে গিয়ে আর কি হবে, তার গাড়ি কখন চলে গিয়েছে কে জানে?

অববুর প্রশ্নে সে চমকে উঠল, "কি এতো ভাবছিস?"

ঘোড়া বেশ মেজাজে দুলকি চালে চলছিল। ভিজে ভিজে একটা হাওয়া বইছিল। রাস্তার দু'ধারের গাছগুলি ছুটে ছুটে চলে যাচ্ছিল। আর তার ডালগুলি ঝুঁকে ছিল। ঘুঙুরের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না। অববু ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটির শ্যামবর্ণ সৌন্দর্যকে নিজের হৃদয় গেঁথে নিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর জানালার একটা শিকের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে দিয়ে এক লাফে পেছনের সিটে মেয়েটির পাশে গিয়ে বসল। ও চুপচাপ বসে ছিল। অববু ওর হাত দুটি ধরে বলল, "দে তোর লাগাম আমার হাতে দে।"

মেয়েটি শুধু বলল, "ছেড়ে দে।" কিন্তু তার আগেই সে অববুর বাহু-পাশে আবদ্ধ হল। সে কোন আপত্তি করল না। নিশ্চয়ই সেই সময়

তার হৃদয়ে খুব তোলপাড় চলছিল। যেন নিজেকে ছেড়ে তা উড়ে যেতে চাইছিল।

অববু ধীরে ধীরে তার ভালোবাসার কণ্ঠে তাকে বলতে লাগল, "এই টাঙ্গা, এই ঘোড়া আমার জীবনের থেকেও প্রিয়। আমি একাদশ পীরের কসম খেয়ে বলছি, এই টাঙ্গা ঘোড়া আমি বেচে তোর জন্যে সোনায় বালা গড়ে দেব। নিজে ছেঁড়া-ফাঁটা কাপড় পড়ব, কিন্তু তোকে রাজকুমারী সাজিয়ে রাখব। ওয়াদহু লা-শরিকের কসম খেয়ে বলছি জীবনে এই আমার প্রথম প্রেম। তুই যদি আমার না হোস তবে তোর সামনেই আমার গলা কেটে ফেলব।

তারপর সে মেয়েটিকে নিজের বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে দিল। বলল, "জানি না আমার কি হয়ে গিয়েছিল, চল, তোকে স্টেশনে ছেড়ে আসি।"

মেয়েটি ধীরে বলল, "না তা আর হয় না। তুমি আমার গায় হাত দিয়েছ।"

অববুর মাথা ঝুঁকে গেল. "আমাকে মাফ করে দে—ভুল হয়ে গিয়েছে।"

—"ভুলটাকে কি শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিতে পারবে?"

মেয়েটির কণ্ঠে চ্যালেঞ্জ ছিল। যেন কেউ অববুকে বলল, "এই টাঙ্গা থেকে এগিয়ে নিয়ে যাও নিজের টাঙ্গা" অববুর হেঁট মাথা সোজা হয়ে গেল। তার চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

অববু তার বলিষ্ঠ বুকের ওপর হাত রেখে বলল, "অববু তোর জন্যে নিজের জান দিয়ে দেবে।"

মেয়েটি তার হাত অববুর দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বলল, "এই নে আমার হাত।"

অববু তার হাত দৃঢ়তার সঙ্গে চেপে ধরে বলল, "কসম আমার যৌবনকে, অববু তোর গোলাম"

পরের দিন অববু আর সেই মেয়েটির নিকা হয়ে গেল। মেয়েটি গুজরাটের কোন এক জেলার মুচির মেয়ে ছিল। তার নাম ছিল ইনায়ত বা নীতি। নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে ও এখানে এসেছিল। স্টেশনে ওরা যখন প্রতীক্ষা করছিল তখন অববুর সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ

হয়। আর সেই সাক্ষাৎই সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসার প্রাসাদ গড়ে তুলল। অববু টাঙ্গা-ঘোড়া বেচে দিয়ে যদিও নীতির জন্যে কোন সোনার বালা গড়ে দেয়নি, কিন্তু তার জমানো টাকা দিয়ে সে তার জন্যে সোনার দুল কিনেছিল। রেশমের কয়েকটি জামা-কাপড়ও তৈরী করেছিল।

রেশমী জামা-কাপড় পড়ে সে যখন অববুর সামনে এসে দাঁড়াত তখন তার হৃদয় নেচে উঠত—"কসম পবিত্র পঞ্জতনের নামে, দুনিয়াতে আমায় চেয়ে খুশীতে পাগল মানুষ আর দুটি নেই।" নীতিকে সে তার বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলত, "তুই আমার দিল কী রাণী।"

দু'জনেই যৌবনের পাগলপনায় ডুবে ছিল। গাইত হাসত ঘুরে বেড়াত আর দু'জন দু'জনের শুভ কামনা করত। এক মাস এমনি কেটে গেল। কিন্তু একদিন হঠাৎ পুলিশ এসে অববুকে গ্রেফতার করল। নীতিকেও ধরে নিয়ে গেল। অববুর ওপর অপহরণের মামলা চলল। নীতি একটুও টলল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অববুর দু বৎসরের কারাদণ্ড হল। আদলত যখন এই ফরমান দিল, তখন নীতি অববুকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদাত কাঁদতে ও শুধু বলল, "আমি আমার মা-বাবার কাছে যাব না—ঘরে বসে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।"

অববু তার পিঠে চাটি মেরে বলল, "বেঁচে থাক,—টাঙ্গা ঘোড়া আমি দীনার জিম্মায় রেখে গেলাম, ভাড়া উশুল করে নিস।"

নীতির বাবা-মা ওকে অনেক বোঝাল, কিন্তু ও কিছুতেই তাদের সঙ্গে গেল না। ক্লান্ত হয়ে অবশেষে তারা হাল ছেড়ে দিল। নীতি একাই থাকতে লাগল। সন্ধ্যার সময় দীনা ওকে পাঁচ টাকা করে দিয়ে যাচ্ছিল। এই পাঁচ টাকা ওর খরচ-খরচার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর তাছাড়া মোকদ্দমার জন্যে প্রতিদিন পাঁচ টাকা থেকে যা খরচ করে বাঁচত তাও ওর কাছেই ছিল।

সপ্তাহে একবার জেলখানায় নীতি আর অববুর দেখা-সাক্ষাৎ হত। আর এই সময়টুকু ছিল ওদের কাছে খুবই সংক্ষিপ্ত। নীতির কাছে যতটুকু জমা টাকা ছিল তা অববুর আরামের জন্যে খরচ হয়ে গেল। এক সাক্ষাতে অববু নীতির খালি কানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নীতি তোর কানের দুল কোথায়?"

নীতি হেসে দিল। হেসে শাল্লীর দিকে একবার তাকিয়ে অববুকে বলল, 'চুপ হয়ে গেলে কেন?'

অববু বেশ কিছুটা রুষ্ট হয়ে বলল, "আমার কথা তোকে এত ভাবতে হবে না। যে ভাবেই থাকি না কেন, ভালোই আছি।"

নীতি কোন জবাব দিল না। সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই হাসতে হাসতে সে ওখান থেকে বেরিয়ে এল কিন্তু বাড়িতে এসে খুব কাঁদল। অনেক—অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল, কারণ অববুর শরীর একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। এবারের সাক্ষাতে অববুকে প্রায় চিনতেই পারছিলনা। দোহারা-চেহারার অববু ভেঙ্গে ভেঙ্গে অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। নীতির মনে হচ্ছিল অববুকে অববুর দুঃখ কুরে কুরে খাচ্ছে। তার বিচ্ছেদেই অববুকে এমন করে দিয়েছে। কিন্তু সে জানত না অববুকে ক্ষয়রোগে ধরেছে। এ অসুখ সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। অববুর বাবা অববুর চেয়ে বলিষ্ঠ ছিল, কিন্তু ক্ষয়রোগ তাকেও অল্পদিনের মধ্যে কবরে নিয়ে গিয়েছিল। অববুর বড় ভাইও সুন্দর জোয়ান ছিল। কিন্তু পরিপূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। তাই জেলের হাসপাতালে সে যখন শেষ নিশ্বাস নিচ্ছিল, তখন দুঃখে সে বলল, 'ওয়াদহু লা শারীকের কসম খেয়ে বলছি, যদি জানতাম এত তাড়াতাড়ি মারা যাব তবে তোকে কখনও বিবি করতাম না·····আমি তোর ওপর অনেক জুলুম করেছি···আমাকে মাফ করে দে···আর আমার এক নিশানা আছে—আমার টাঙ্গা-ঘোড়া···একটু নজর দিস···আর চুন্নী বেটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলিস, অববু তোকে ভালোবাসা পাঠিয়েছে।"

অববু মারা গিয়েছিল···নীতিরও সব কিছু মারা গিয়েছিল। কিন্তু ও ছিল সাহসী মহিলা। এই দুঃখকে ও সহ্য করে নিয়েছিল। ঘরে একা একা পড়ে থাকত। সন্ধ্যার সময় দীনা আসত। এসে তাকে ভরসা দিয়ে বলত, "কোন কিছু ভেব না ভাবী, খোদার আগে কারও হাত নেই। অববু আমার ভাই ছিল···আমার পক্ষে যা করা সম্ভব, খোদার হুকুমে আমি তা করব।"

প্রথম প্রথম নীতি কিছুই বুঝতে পারত না। কিন্তু যখন শোকের দিন পুরো হল, তখন দীনা খোলাখুলি তাকে বিয়ে করতে বলল। দীনার কথায়

শুনেই নীতির মনে হল ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘরের বাইরে বের করে দেয়। দীনাকে শুধু সে বলল, "ভাই আমি বিয়ে করব না।"

সেইদিন থেকে দীনার ব্যবহারও পালটে গেল। আগে প্রতি দিনই সন্ধ্যায় পাঁচ টাকা আদায় হত। এখন কোন দিন চার টাকা, কোন দিন তিন টাকা করে দিতে লাগল। বাহানা দিতে লাগল খুব মন্দা চলছে। আবার কখনও কখনও দু-দু তিন-তিন দিন বেপাত্তা হয়ে থাকতে লাগল। কখনও বলত অসুখ করেছে, কখনও বাহানা দিত গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছে সেজন্যে ঘোড়া জুততে পারিনি। ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারল, তখন সে দীনাকে বলল, "ভাই দীনা, তোমার আর হয়রান হওয়ার প্রয়োজন নেই। টাঙ্গা ঘোড়া আমাকে জমা দিয়ে যাও।"

অনেক টালবাহানার পর মুখ কাচুমাচু করে সে টাঙ্গা এবং ঘোড়া নীতিকে ফেরত দিল। যাওয়ার সময় দীনা মাঝেকে দিয়ে গেল। মাঝে ছিল অববুর বন্ধু। সেও কয়েকদিন পরে নীতির কাছে বিয়ের প্রার্থনা করল। নীতি অস্বীকার করলে তার চোখের ভাষাও পাল্টে গেল। সহানুভূতিটুতি সব উবে গেল। তার কাছ থেকেও নীতি টাঙ্গা ঘোড়া ফেরত নিল নিয়ে এবং এক অচেনা কোচোয়ানকে দিল।

এক সন্ধ্যায় সে যখন পয়সা দিতে এল তখন সে নেশায় বুঁদ ছিল। দরজায় পা দিয়েই সে নীতির গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করল। নীতি তাকে খুব একচোট নিল এবং কাছ থেকে তাড়িয়ে দিল।

আট দশ দিন টাঙ্গা-ঘোড়া এমনিই আস্তাবলে পড়ে রইল। ঘাস এবং দানার খরচ ছাড়াও আস্তাবলের ভাড়া ছিল। নীতি এক অদ্ভুত চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিল। কেউ বিয়ের প্রার্থনা করে, কেউ তার অসম্মতির ওপর হাত লাগানোর চেষ্টা করে, কেউ পয়সা মেরে দেয়। বাইরে বের হলে মানুষ খারাপ নজরে ঘুরে ঘুরে দেখে। এক রাতে তার এক প্রতিবেশী দেয়াল টপকে তার ঘরে এল এবং তার গায়ে হাত দিল। ভাবতে ভাবতে নীতি পাগল হয়ে যাবার উপক্রম, এখন সে কি করে।

একদিন বসে ভাবতে ভাবতে তার মাথায় এল, আমি কেন নিজেই টাঙ্গা জুতি না—নিজেই চালাই। যখন সে অববুর সঙ্গে বেড়াতে

মেয়ে হত তখন তো সে নিজেই টাঙ্গা চালাত। শহরের রাস্তা-ঘাটও তো জানা। কিন্তু সে আবার ভাবল, লোকে কি বলবে? তার মন এবং চেতনাই তাকে উত্তর জোগাল—এতে কি আছে, মেয়েরা মেহনত করে রোজগার করে—কয়লার খনিতে কাজ করে অফিসে-দপ্তরে কাজ করে, ঘরে বসেও কাজ করার মেয়েওতো হাজার হাজার আছে। যেমন করেই হোক পেট চালাতে হবে।

কয়েকদিন ধরে নীতি চিন্তা-ভাবনা করল। শেষে সে ঠিক করল, টাঙ্গা সে নিজেই চালাবে। নিজের ওপর তার পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল। সুতরাং খোদার নাম নিয়ে সে আস্তাবলে গেল। টাঙ্গা জুততে দেখে সমস্ত কোচোয়ানরা অবাক হয়ে রইল। কেউ মজার ব্যাপার ভেবে একচোট হাসল। যারা বয়স্ক ছিল তারা নীতিকে এ কাজ না করার জন্যে বোঝাল। এ ঠিক নয়। কিন্তু নীতি তাদের কথায় কান দিল না। টাঙ্গা ঠিক ঠাক করে নিল। পিতলের তকমাগুলি পরিষ্কার করে ঝকমক করে তুলল। ঘোড়াকে খুব আদর করল। আর অববুর সঙ্গে মনে মনে ভালোবাসার কথা বলতে বলতে আস্তাবলের বাইরে বেরিয়ে এল। কোচোয়ানরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল টাঙ্গা চালানের কৌশলে নীতির নিপুণ হাত দেখে।

শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেল, এক সুন্দরী মেয়ে মানুষ টাঙ্গা চালাচ্ছে। সমস্ত জায়গায় শুধু এই একই আলোচনা চলছিল।

প্রথমে প্রথমে পুরুষ-সওয়ারিরা টাঙ্গায় উঠতে দ্বিধা করছিল, কিন্তু অল্প দিনেই সে-দ্বিধা দূর হয়ে গেল। এবং খুব রোজগার হতে লাগল। এক মিনিটের জন্যেও নীতির টাঙ্গা খালি থাকত না। এক সওয়ারি নামতে না নামতেই আর একজন উঠে বসত। কে তাকে প্রথম ডেকেছে তাই নিয়ে কখনও কখনও সওয়ারিদের মধ্যে লড়াই পর্যন্ত হয়ে যেত।

কাজের চাপ যখন বেড়ে গেল তখন নীতি টাঙ্গা চালানোর সময় ঠিক করে নিল। সকাল সাতটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত, এবং দুটো থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত। এই সময়টুকুই তার নিজের কাছে

সুখকর মনে হত। চুন্নীও খুশী ছিল। কিন্তু ও অনুভব করতে লাগল অধিকাংশ মানুষই তার নৈকট্যতার জন্যে টাঙ্গায় চড়ে। বিনা মতলবে, বিনা উদ্দেশ্যে ওকে এদিকে ওদিকে নিয়ে যেত। নিজেদের মধ্যে কুৎসিত ঠাট্টা তামাশা করত। শুধু ওকে শোনানোর জন্যেই এসব কথা-বার্তা বলত। ওর মনে হতে লাগল ও নিজেকে না বেচলেও মানুষ চুপে চুপে ওকে কেন-কাটি করছে। তাছাড়া ও জানত শহরের সমস্ত কোচোয়ানরা ওকে ভালো চোখে দেখছে না। এসব জানা সত্বেও ও এতটুকু উৎকণ্ঠিত ছিল না নিজের নিজের আত্ম-বিশ্বাসের জন্যে ও সন্তুষ্ট ছিল।

একদিন মিউনিসিপ্যাল কমিটি নীতিকে ডেকে পাঠাল এবং তার লাইসেন্স কেড়ে নিল। কারণ হিসেবে বলল, 'মেয়ে মানুষ টাঙ্গা চালাতে পারে না।" নীতি জিজ্ঞেস করল, "জনাব, মেয়ে মানুষ টাঙ্গা কেন চালাতে পারবে না?"

কমিটি জবাব দিল. "ব্যাস, চালাতে পারে না, তোমার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হল।"

নীতি বলল, "হুজুর, আপনি টাঙ্গা-ঘোড়াও বাজেয়াপ্ত করে নিন। কিন্তু আমাকে অন্তত এইটুকু বলুন, "মেয়ে মানুষ কেন টাঙ্গা জুততে পারবে না? মেয়েরা চরকা চালিয়ে পেট চালাতে পারে, টুকরি বয়ে রোজগার করতে পারে, লাইনের ওপর কয়লা কুড়িয়ে নিজের পেটের জন্যে খাবার সংগ্রহ করতে পারে, তবে আমি কেন টাঙ্গা চালাতে পারব না? আমি আর কোন কাজ জানি না টাঙ্গা ঘোড়া আমার স্বামীর। কেন আমি তা চালাতে পারব না? হুজুর, আপনি দয়া করুন। মেহনত-মজদুরি আপনি কেন বন্ধ করে দিচ্ছেন? আমি কি করব? আমাকে বলে দিন।"

অফিসার বলল, "যাও, বাজারে গিয়ে বস। ঐখানে ভালো কামাই হবে।"

অফিসারের কথা শুনে নীতির ভেতর যে আসল নীতি ছিল তা জ্বলে ছাই হয়ে গেল। খুব ধীরে 'আচ্ছা জী' বলে ও বেরিয়ে এল। জলের দামে টাঙ্গা-ঘোড়া বিক্রি করে দিয়ে ও সোজা অববুর কবরের কাছে

গেল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর চোখের জল একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল—যেমন বর্ষারপর প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ খেতের নরম ভাবকে শুকিয়ে দেয়। ওর বন্ধ ঠোঁট খুলে গেল। কবরকে সম্বোধন করে বলল, "অববু তোর নীতি আজ কমিটির দপ্তরে মারা গিয়েছে।"

শুধু এই কথাটুকু বলে ও চলে এল। পরের দিন ও আর্জি পেশ করল। নিজের দেহ বেচার লাইসেন্স ও পেয়ে গেল।

॥ শাহদৌলার ইঁদুর ॥

সলিমার যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স একুশ। তারপর পাঁচ বৎসর কেটে গিয়েছে, কিন্তু তার কোন ছেলেপেলে হয়নি। তাই মা এবং শাশুড়ি খুব চিন্তিত। মার একটু বেশীই চিন্তা ছিল, কারণ সলিমার স্বামী নজিব আর একটা বিয়ে করে না ফেলে। বেশ কয়েকজন ডাক্তারের পরামর্শও নেওয়া হয়, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না।

সলিমা নিজেও খুব চিন্তিত ছিল। বিয়ের পর খুব কম মেয়েই আছে যার সন্তানের ইচ্ছা হয় না। সে তার মার সঙ্গে এ নিয়ে কয়েকবার পরামর্শও করেছে। মার বুদ্ধি মতো চলেও কোন লাভ হয়নি।

একদিন তার বান্ধবী, যাকে বাজা বলা হত, সলিমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার কোলে একটা নাদুস-নুদুস ছেলে দেখে সলিমা খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। সলিমা তার সে আশ্চর্য ভাব নিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'ফাতেমা, তোমার এই ছেলে কেমন করে হল?"

বয়সে ফাতেমা তার থেকে পাঁচ বৎসরের বড় ছিল। সে মুচকি হেসে বলল, "এ হচ্ছে শাহদৌলা সাহেবের মেহেরবানি। একজন মহিলা আমাকে বলে, তুমি যদি সন্তান চাও তবে গুজরাটে গিয়ে শাহদৌলা সাহেবের মাজারে প্রার্থনা করে বল, আমার প্রথম যে বাচ্চা হবে তা আপনার মাজারে উৎসর্গ করব।"

সলিমাকে সে আরও বলল যে শাহদৌলা সাহেবের মাজারে প্রার্থনা করার পর প্রথম যে বাচ্চা হবে তার মাথা খুব ছোট হয়। ফাতেমার এই কথা সলিমার ভালো লাগল না। কিন্তু সে নজিবকে বলল যে প্রথম

বাচ্চা যদি শাহদৌলা সাহেবের গর্তে দিয়ে আসতে হয় তবে তা খুবই দুঃখজনক।

সে মনে মনে ভাবল, এমন কোন মা আছে যে নিজের বাচ্চার কাছে থেকে চিরদিনের জন্যে আলাদা হয়ে থাকবে। তার মাথা ছোট হোক, নাক চ্যাপ্টা হোক, চোখ কানা হোক মা তাকে কিছুতেই দুর্দশার মধ্যে ছুঁটে ফেলে দিতে পারে না। যাই-ই করতে হোক না কেন, সন্তান তার চাই-ই। তাই সে তার চেয়ে বয়সে বন্ধু বান্ধবীর কথা স্বীকার করে নিল। কারণ, যে গুজরাটে শাহদৌলার মাজার সেখানকার সে মেয়ে ছিল। সে তার স্বামীকে বলল, "ফাতেমা বারবার বলছে গুজরাটে আমার সঙ্গে চল। তুমি যদি বল তবে ওর সঙ্গে যাই।" তার স্বামীর এতে কি আপত্তি থাকতে পারে। তাই সে বলল, "যাও তবে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এস।"

সে ফাতেমার সঙ্গে গুজরাটে চলে গেল।

সে যেমন ভেবেছিল তা নয়। শাহদৌলার মাজার বহু মূল্যবান পাথরে তৈরী ছিল না। বেশ খোলা-মেলা জায়গায় ছিল। সলিমার খুব ভালো লাগল। কিন্তু এক ভিড়ের মধ্যে সে শাহদৌলা ইঁদুর দেখতে পেল। তার নাক দিয়ে সিকনি পড়ছিল। বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই ছিল না। দেখে সালিমা শিউরে উঠল।

তার সামনেই একটি যুবতী দাঁড়িয়েছিল। যৌবন তার সারা শরীরে চলমল করছিল, কিন্তু সে এমন ভাব ভঙ্গী করছিল যে খুব গম্ভীর মানুষও না হেসে থাকতে পারবে না। তাকে দেখে সলিমা মুহূর্তের জন্যে হাসল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ জলে ভরে উঠল। ভাবতে লাগল, না জানি এ মেয়ের কি হবে? এখানকার মালিক একে কারো কাছ বিক্রি করে দেবে। আর সে তাকে বাঁদর সাজিয়ে নানা জায়গায় ঘোরাবে। এই হতভাগী তার রুজির উপায় হবে।

মেয়েটির মাথা খুব ছোট ছিল। সে ভাবল মাথা ছোট হলে তো মানুষের ভাগ্য আর ছোট হয় না। পাগলদেরও তো মাথা আছে।

শাহদৌলার এই মেয়ে ইঁদুরটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল। তার প্রতিটি অঙ্গ ছিল নিখুঁত। মনে হচ্ছিল তার চেতনা শক্তি ইচ্ছে করেই নষ্ট

করে দেওয়া হয়েছে। সে এমন ভাবে হাঁটা-চলা করছিল এবং হাসছিল যেন কলের একটা খেলনা। সলিমার মনে হচ্ছিল এই উদ্দেশ্যের জন্যেই তাকে এমন করা হয়েছে।

কিন্তু এসব অনুভব সত্ত্বেও সে তার বান্ধবী ফাতেমার কথা মতো শাহদৌলা সাহেবের মাজারে প্রার্থনা করল, তার বাচ্চা হলে সে তাকে এখানে উৎসর্গ করবে।

ডাক্তারের চিকিৎসা সলিম বন্ধ করল না। ছ'মাস পর বাচ্চা হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল। সে খুব খুশী হল। সময় মতো তার একটা ছেলেও হল। ছেলেটা দেখতে খুব সুন্দর। গর্ভবতী হওয়ার সময় চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। তাই ছেলেটির ডান গালে ছোট্ট একটা কালো দাগ ছিল, যে দাগটির জন্যে ছেলেটিকে দেখতে খারাপ লাগত না।

ফাতেমা এসে বলল, বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি শাহদৌলা সাহেবকে দিয়ে দেওয়া উচিত। সলিমা নিজেও তা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে টালবাহানা করতে লাগল। তার মন কিছুতেই মানছিল না কি ভাবে সে তার চোখের মনি এই ছেলেকে ছুঁড়ে দিয়ে আসে।

তার যুক্তি ছিল, শাহদৌলা সাহেবের কাছে যে সন্তান চায় তার সেই প্রথম সন্তানের মাথা ছোট হয়। কিন্তু তার ছেলের মাথা তো বেশ বড়সর। ফাতেমা তাকে বলল, "সব সময় যে তা হবে এমন কোন কথা নয়, তুমি মিছেমিছি বাহানা করছ। তোমার বাচ্চার ওপর শাহদৌলা সাহেবের হক আছে। এর ওপর তোমার কোন অধিকার নেই। তুমি যদি তোমার কথা না রাখ' তবে তোমার ওপর এমন গজব হবে যে তুমি জীবনে তা ভুলতে পারবে না।"

দুঃখে ভরপুর হৃদয় নিয়ে সলিমা তার নাদুস-নুদুস ছেলেকে, যার ডান গালে একটা ছোট্ট তিল ছিল—গুজরাটে গিয়ে শাহদৌলা সাহেবের মাজারের সেবকদের হাতে তুলে দিতে হল।

সে খুব কাঁদল। দুঃখে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। এক বৎসর ধরে জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে টানা পোড়ন চলল। সে তার সন্তানের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। বিশেষ করে ডান গালের কালো তিলের কথা

সলিমা বৰবিবার মনে পড়ছিল, যে তিলের ওপর হামেশাই সে চুমু দিত। কারণ, এ তিল তাকে আরও সুন্দর করে তুলেছিল।

এই সময়টুকুর মধ্যে সে এক মুহূর্তের জন্যেও তার সন্তানকে নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। সে অদ্ভুত ধরণের সব স্বপ্ন দেখত। শাহদৌলা ইঁদুরের রূপ নিয়ে তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলত। তার শরীরের মাংসকে তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে কাটত। সে চীৎকার করে তার স্বামীকে বলত, "আমাকে বাঁচাও, ইঁদুর আমার মাংস কাটছে। ইঁদুরের গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। সে যেন তার লেজ টেনে ধরে আছে। কিন্তু গর্তের মধ্যে যে বড় বড় ইঁদুরগুলো আছে, তারা তার থুথনি কামড়িয়ে ধরেছে। আর তাই সে তাকে টেনে বাইরে বের করতে পারছে না।

এখনও কখনও বা সে সেই মেয়েটিকে মানস চোখে দেখতে পেত। পরিপূর্ণ যৌবনে-ভরা সেই মেয়েটি—যাকে সে শাহদৌল্লার মাজারের কাছে দেখেছিল। সলিমা হাসতে শুরু করে দিত। কিন্তু একটু পরেই সে কাঁদতে লাগত। সে এমন কাঁদতে শুরু করত যে তার স্বামী নজিব বুঝতে পারত না কিভাবে সে তার কান্না থামাবে।

সলিমা বিছানার ওপর রান্না ঘরে বাথরুমে সোফার ওপর হৃদয়ে কানে সব জায়গাতেই ইঁদুর দেখতে লাগল। কখনও কখনও বা নিজেকেই তার ইঁদুর বলে মনে হত। তার নাক থেকে সিকনি ঝরছে। সে শাহদৌল্লার মাজারের বসিন্দাদের মধ্যে তার ছোট্ট—খুব ছোট্ট দুর্বল মাথা নিয়ে এমন ভাব-ভঙ্গী করত যে, দেখে তারা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। তার অবস্থা খুব দুঃখজনক হয়ে উঠল।

সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই সে কালো কালো দাগ দেখতে লাগল জ্বর একটু কমলে সলিমার শরীর কিছুটা সুস্থ হল নজিব খানিকটা আশ্বস্ত হল। সে সলিমার অসুখের কারণ জানত। নজিব খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিল। [illegible] সন্তানকে উৎসর্গ করার জন্যে তার কোন দুঃখ ছিল না। যা কিছু ঘটেছিল তা মেনে নিয়েছিল। সে বিশ্বাস করত তার যে ছেলে হয়েছিল তা তার নয়, শাহদৌলা সাহেবের।

সলিমার ঘর একেবারে কমে গেল এবং মন ও মস্তিষ্কের ঝড় থেমে গেল নজিব তাকে বলল, "সলিমা, নিজের বাচ্চার কথা ভুলে যাও, ও আমাদের দুঃখের ধন ছিল।"

সলিমা খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, "কিন্তু মন যে মানছে না। সারাজীবন ধরে নিজের মমতাকে ধিক্কার দিয়ে চলব, কারণ আমি আমার চোখের মনিকে মাজারের চাকরের হাতে তুলে দিয়ে এসেছি। এযে কত বড় পাপ। চাকর কখনও মা হতে পারে না।"

একদিন সে পালিয়ে সোজা গুজরাটে চলে গেল। এবং সাত-আটদিন সেখানে থাকল। সে তার বাচ্চার খোঁজ-খবর করল। কিন্তু কোন খবর পেল না। নিরাশ হয়ে সে ফিরে এসে তার স্বামীকে বলল, 'আমি আর ওর কথা কখনও ভাবব না।'

কিন্তু সে ওর কথা তুলতে পারল না। মনে মনে ভাবত। তার বাচ্চার ডান গালের দাগ তার হৃদয়ের দাগ হয়ে রইল। এক বৎসর পর তার এক মেয়ে হল। তার চেহারা হুবহু তার প্রথম সন্তানের মতো ছিল। শুধু ওর ডান গালে কোন তিল ছিল না। তার নাম সে মুজিবা রাখল, কারণ প্রথম সন্তানের নাম সে মুজিব রাখবে ভেবেছিল। যখন তার মাস দুই বয়স তখন একদিন সলিমা সুর্মাদানী থেকে সুরমা নিয়ে তার ডান গালে একটা তিল এঁকে দিল। আর মুজিবের কথা ভেবে কাঁদতে লাগল। দু'গাল বেয়ে যখন জল গড়তে লাগল তখন সে তা তার ওড়না দিয়ে মুছে হাসতে লাগল। সে তার দুঃখ ভুলে যাওয়ার জন্যে চেষ্টা করছিল।

এরপর সলিমার আরও দুটি ছেলে হয়। তার স্বামী খুব খুশী ছিল।

একবার তারএক বান্ধবীর বিয়ে উপলক্ষে সলিমাকে গুজরাটে যেতে হয়েছিল। এই সুযোগে সে আর একবার মুজিবের খোঁজ-খবর নিল। কিন্তু কোন খবর পেল না। সে ভাবল, হয়তো মারা গিয়ে থাকবে। তাই বৃহস্পতিবার সে খুব ধুমধাম করে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করল।

আশ-পাশের সমস্ত মহিলারা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, সে কার জন্যে এমন ঝঞ্ঝাট করছে। কেউ কেউ সলিমাকে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু সে কাউকে কোন জবাব দিল না।

সন্ধ্যার সময় সে তার দশ বৎসর বয়সের মেয়েকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল। সুরমা দিয়ে তার ডান গালে তিল দিয়ে সেই তিলের ওপর খুব চুমু খেতে লাগল।

মুজিবাকে সে তার হারিয়ে যাওয়া ছেলে মনে করত। এখন থেকে সে তার কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিল তার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পর ওর মনের বোঝা অনেকটা লাঘা হয়ে গেল। সে তার হৃদয়ের দুনিয়াতে তার কবরও রচনা করে নিয়েছিল। আর সেই কবরের ওপর সে তার ভাবনার ফুল ছড়িয়ে দিতে লাগল।

তার তিন ছেলে-মেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করত। প্রতিদিন ভোরে সলিমা তাদের তৈরী করে দিত। তাদের জন্যে জলখাবার বানাত। তাদের প্রত্যেককে এক এক করে দেখত। স্কুলে চলে যাওয়ার পর মুহূর্তের জন্যে তার মুজিবের কথা মনে পড়ত। যদিও সে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেছিল—তার হৃদয়ের বোঝা হাল্কা হয়ে গিয়েছিল, তবুও মাঝে মাঝে তার মনে হত মুজিবের ডান গালের কালো তিল মন জুড় বসে আছে।

একদিন তার তিন ছেলে-মেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে তাকে বলল, 'আম্মা, আমরা তামশা দেখব।"

সে খুব স্নেহের সঙ্গে বলল, "কি তামাশা?"

সবচেয়ে বড় মেয়ে বলল, "আম্মা একটা লোক কি সুন্দর তামাশা দেখাচ্ছে।"

সলিমা বলল, "যাও ওকে ডেকে আন। ঘরের মধ্যে যেন না আসে বাইরেই যেন তামাশা দেখায়।"

বাচ্চারা দৌড়ে সেই লোকটাকে ডেকে এনে তামাশা দেখতে লাগল। খেলা শেষ হয়ে গেলে মুজিবা তার মার কাছে গেল পয়সা আনতে। মা পার্স খুলে চার আনা বের করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সদর দরজার কাছে গিয়ে সে দেখল পাহদৌলার ইঁদুর এক বিচিত্র মুদ্রায় নিজের মাথা দুলেছে। সলিমার হাসি পেয়ে গেল।

দশ-পনেরোটি বাচ্চা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তারা এমন হট্টগোল করছিল যে কোন কথাই শোনা যাচ্ছিল না। সলিমা চার আনা হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। শাহদৌলার সেই ইঁদুরের হাতে পয়সা দিতে গিয়ে

এক ঝটকায় সে পিছনে সরে এল, যেন বিদ্যুতের তারে সে হাত দিয়েছে। সেই ইঁদুরের ডান গালে একটা কালো তিলছিল। সলিমা খুব ভালোভাবে তাকে দেখল। তার নাক দিয়ে সিকনি ঝরছিল। মুজিবা তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে তার মাকে বলল, "আম্মা,—এই—এই ইঁদুরের মুখের সঙ্গে আমার মুখের কি মিল, তাই না? আমি কি ইঁদুর?"

সলিমা শাহদৌলার সেই ইঁদুরের হাত চেপে ধরে বাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে তাকে চুমু দিল—তাকে আদর করল। সে ছিল তার মুজিব। কিন্তু সে এমন ভঙ্গী করছিল যে সলিমার দুঃখের হৃদয়েও হাসি এসে থেমে যাচ্ছিল।

"সে মুজিবকে বলল, "খোকা, আমি তোমার মা।"

শাহদৌলার ইঁদুর খুব জোরে হেসে উঠল। নাকের সিকনি জামার আস্তিন দিয়ে মুছে তার মার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "একটা পয়সা।" মা পার্স খুলল, কিন্তু তার দু'মোখ আগেই জলে ভরে গিয়েছিল। সে একশ টাকার নোট বের করে বাইরে গিয়ে যে তার ছেলেকে নিয়ে তামাশা দেখাচ্ছিল সেই লোকটাকে দিল। সে এত কম টাকা নিয়ে তার রুটি-রুজিকে বিক্রী করতে অস্বীকার করল। অবশেষে সলিমা তাকে পাঁচশ' টাকায় রাজী করাল। টাকা দিয়ে সে ভিতরে এসে দেখল মুজিব সেখানে নেই। মুজিবা তাকে বলল সে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

সলিমার অন্তর চীৎকার করে বলতে লাগল, মুজিব ফিরে এস কিন্তু সে এমন ভাবে হারিয়ে গেল যে আর কখনও ফিরে এল না।

।। স্বরাজের জন্যে ।।

কোন্ সাল তা আর ঠিক মনে নেই তবে সেই দিনগুলি শুধু ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সারা অমৃতসর গমগম করত। এই শ্লোগান আমি ভুলতে পারিনি, কারণ এই শ্লোগানে এক অদ্ভুত জোস—এক অদ্ভুত ধরণের যৌবনের মাদকতা ছিল। সেই জোস মাদকতা ছিল অনেকটা অমৃতসরের ঘুড়িওয়ালীদের মতো, যারা মাথায় টুকরি নিয়ে বাজারে যেত তা

বিক্রির জন্যে। দিনগুলি সত্যিই সুন্দর ছিল। জালিয়ানওয়ালা বাগের সারা পরিবেশে এতদিন যে রক্তাক্ত ঘটনার ভয় জমাট বেঁধে ছিল তা যেন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল। আজ সেখানে চলেছে এক নির্ভীক তড়পানি। যে তড়পানি ছিল উদ্দেশ্যহীন ঝোড়-ঝাঁপের মতো—যার কোন মঞ্জিল—কোন নিশানা ছিল না।

মানুষ শ্লোগান দিত, মিছিল বের করত আর শেষে শেষে গ্রেফতার হয়ে যেত। এ এক সুন্দর গ্রেফতার গ্রেফতার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকালে গ্রেফতার করা হত আর সন্ধ্যায় ছেড়ে দেওয়া হত। মোকদ্দমা চলত, কয়েক মাস জেলে কাটিয়ে বেরিয়ে আসত। আবার শ্লোগান দিত, আবার জেলে যেত।

দিনগুলি ছিল জীবনে ভরপুর। একটা ছোট্ট বুদবুদ কাটলেও তা ঘূর্ণি-পাকে পরিণত হত। কেউ চকে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে বলল, "হরতাল করতে হবে", সঙ্গে সঙ্গে হরতাল হয়ে গেল। হঠাৎ এক গুঞ্জনের ঢেউ উঠল, প্রত্যেককে খাদি পরতে হবে। খাদি পরলে ল্যাঙ্কাশায়ারের সমস্ত কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কাপড় বয়কট আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। আর প্রতিটি চকে আগুন জ্বলতে লাগল। মানুষ সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গা থেকে কাপড় খুলে সেই আগুনে ছুঁড়ে দিতে লাগল। কোন কোন মহিলারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের অপছন্দ শাড়িগুলি ছুঁড়ে দিত, আর ভিড়ের লোকজন তালি মেরে মেরে হাত লাল করে তুলত।

আমার মনে আছে, কোতয়ালির সামনে, টাউন হলের কাছে এক অগ্নি উৎসব চলছিল। আমার সহপাঠি শেখু উৎসাহে তার রেশমের কোট খুলে কাপড়ের এই জ্বলন্ত চিতায় দিয়ে দিল। তালির সমুদ্র গর্জন করে উঠল। কারণ শেখু ছিল এক 'টোডি বাচ্চার' ছেলে। তালির গর্জনে শেখুর জোস বেড়ে গেল। বোস্কির জামা খুলে সে আগুনে উৎসর্গ করল। পরে তার মনে পড়ে গেল ঐ জামার সঙ্গে সোনার বোতাম ছিল।

আমি শেখুকে নিয়ে ঠাট্টা করছি না। সেইসব দিনগুলিতে আমার অবস্থাও এই রকম ছিল। মনে হত, হাতে যদি একটা পিস্তল থাকত তবে আমি বিপ্লবী পার্টি বানিয়ে ফেলতাম। বাবা সরকারী পেনসন পেতেন, কিন্তু সে কথা আমি কোন দিন ভাবিনি। আমার ভেতরে এক অদ্ভুত ধরণের

উত্তেজনা টগবগ করত। ক্লাস খেলার সময় যে ধরণের উত্তেজনা টগবগ করে অনেকটা সেই রকম।

স্কুল সম্পর্কে আমার তেমন কোন মমতা ছিল না, তাই পড়া-শোনার সঙ্গে আমার বেশ শত্রুতা সৃষ্টি হল। বাড়ি থেকে বই-খাতা নিয়ে বেরিয়ে জালিয়ানওয়ালা বাগে যেতাম। স্কুল ছুটি না হওয়া পর্যন্ত কোন গাছের ছায়ায় বসে বসে সেখানকার সরগরম দেখতাম বা দূরের বাড়িগুলোর জানালায় দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতাম এদেরই মধ্যে কোন একজনের সঙ্গে আমার প্রেম হবে। কেন এ ধরণের চিন্তা আমার মাথায় আসত তা আমি জানি না।

জালিয়ানওয়ালা বাগ তখন খুব জাঁকজমকে ভরা ছিল। চারদিকে লাইনবন্দী তাবু আর সামিয়ানা খাটানো থাকত। সবচেয়ে বড় সামিয়ানাতে দু'একদিন পরপরই এক একজনকে ডিকটেটর করে বসিয়ে দেওয়া হত। আর সেই ডিকটেটরকে সমস্ত স্বয়ংসেবকরা কুর্নিশ করত। দু-তিন দিন বা খুব বেশী হলে দশ-পনেরো দিন সেই ডিকটেটর খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে খদ্দরের পোষাক-পরা মহিলা এবং পুরুষদের কাছ থেকে কুর্নিশ আদায় করত। লঙ্গরখানার জন্যে শহরের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাল এবং আটা সংগ্রহ করত। জালিয়ানওয়ালা বাগে এত আম থাকতে খোদাই জানে তারা কেন ওই লপসি খেত আর হঠাৎ একদিন গ্রেফতার হয়ে জেলখানায় চলে যেত।

আমার এক সহপাঠী ছিল—নাম শাহজাদা গুলাম আলী। আমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব কত গভীর ছিল তা শুধু আপনারা এর থেকেই সহজে আন্দাজ করতে পারবেন। আমরা দু'জনে দু'বার একসঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছিলাম, আর একবার আমরা পালিয়ে বোম্বাই গিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল রাশিয়াতে যাব, কিন্তু পয়সা শেষ হয়ে যাওয়ায় আমাদের ফুটপাতে কাটাতে হয়েছিল, তাই ক্ষমা চেয়ে বাড়িতে চিঠি লিখে ফিরে আসতে হয়।

শাহজাদা গুলাম আলীর চেহারা ছিল খুব সুন্দর। লম্বা, গায়ের রঙ কাশ্মীরীদের মতো লাল টকটকে। তীক্ষ্ণ নাক, টানা টানা চোখ। চালচলনে এমন এক আভিজাত্য ছিল যে সেই আভিজাত্যে পেশো-

যারা গুণ্ডাদের মেজাজের এক হাল্কা আভাস ঝিলিক দিয়ে উঠত।

আমার সঙ্গে সে যখন স্কুলে পড়ত তখন সে শাহজাদা ছিল না। কিন্তু শহরে যখন ইনক্লাবের হৈ চৈ পড়ে গেল তখন সে দশ পনেরোটা সমাবেশ এবং মিছিলে যোগ দিল। শ্লোগান দিয়ে, গলায় গাঁদা ফুলের মালা পড়ে, প্রেরণাদায়ক গান গেয়ে এবং স্বয়ং-সেবকদের সঙ্গে প্রকাশ্য আলাপ-আলোচনা করে সে এক আধ পাকা বিপ্লবীতে পরিনত হল। একদিন সে নিজেই বক্তৃতা দিল। পরের দিন খবরের কাগজ দেখে আমি বুঝতে পারলাম গুলাম আলী শাহজাদা হয়ে গিয়েছে।

শাহজাদা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলাম আলী সারা অমৃতসরে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। ছোট শহরে সুনাম আর দুর্নাম ছড়াতে বেশী দেরী লাগে না। অমৃতসরের সমস্ত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা খুব সমালোচক। একজন আর একজনের দোষ এবং কলঙ্ক খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতাদের ব্যাপারে তার একেবারে অন্য মানুষ। আসলে তাদের জন্যে সবসময় বক্তৃতা এবং আন্দোলনের প্রয়োজন। আপনি তাদের নীলবর্ণই বানান আর মসি বর্ণই বানান তাতে তাদের কিছু আসে যায় ন। একই নেতা শুধু চোগা-চাপকান পালটিয়ে অমৃতসরে বহুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেন।

কিন্তু সেই দিনগুলি ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। বড় বড় নেতারা সব জেলে ছিলেন। ফলে তাঁদের গদিগুলি খালি পড়ে ছিল। সেই সময় নেতাদের অভাব মানুষ তত বেশী করে অনুভব করত না। যে আন্দোলন তখন চলছিল তার জন্যে এমন সব মানুষের প্রয়োজন ছিল, যারা দু'একদিন খদ্দরের জামা কাপড় পড়ে জালিয়ানওয়ালা বাগে সামিয়ানার নীচে বসে দু-একটা ভাষণ দিতে পারে এবং ভাষণ দেওয়ার পর গ্রেফতার হতে পারে।

তখন ইউরোপে সবে ডিকটেটরসিপ চালু হয়েছিল। হিটলার আর মুসোলিনীর নাম-ডাক শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এর ফলশ্রুতি হিসেবে কংগ্রেসও ডিকটেটর তৈরী করতে শুরু করল। শাহজাদ গুলাম আলীর সময় আসার আগে চল্লিশ জন ডিকটেটর গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিল।

আমি যখন বুঝতে পারলাম গুলাম আলী ডিকটেটর হয়ে গিয়েছে, তখন আমি তাড়াতাড়ি করে জালিয়ানওয়ালা বাগে হাজির হলাম। বড়

সামিয়ানার নীচে স্বয়ং সেবকদের পাহারা বসানো ছিল। কিন্তু গুলাম আলী আমাকে দেখতে পেয়ে ভেতরে ডেকে নিল—মাটিতে একটা গদি পাতা ছিল। আর তার ওপর একটা খদ্দরের চাদর বিছানো ছিল। আর এই গদির ওপর একটা পাশ বালিশে হেলান দিয়ে শাহজাদা গুলাম আলী জনা কয়েক খদ্দরের পোশাক-পড়া ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বার্তা বলছিল। খুব সম্ভব তরিতারকারি নিয়ে আলোচনা চলছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা শেষ করে শাহজাদা স্বয়ং সেবকদের হুকুম দিল। হুকুম দিয়ে সে আমার দিকে তাকাল। তার এই অসাধারণ গাম্ভীর্য দেখে আমার ফিকফিক করে হাসি পাচ্ছিল। স্বয়ং সেবকরা চলে গেল আমি হেসে বললাম, 'এই শালা শাহজাদা।'

আমি অনেকক্ষণ ধরে ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগলাম, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম গুলাম আলীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এই পরিবর্তন তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল। কয়েকবার সে আমাকে বলল, 'সাদত, এমন হাসি-হাট্টা করো না। আমি জানি আমার বুদ্ধি তেমন নেই, কিন্তু যে ইজ্জত আমি পেয়েছি তা তুলনাহীন, তাই আমি এই টুপি পরে থাকতে চাই।"

তারপর সে আমাকে বড় গ্লাসের এক গ্লাস দই-এর লস্যি খাওয়াল। সন্ধ্যার সময় তার ভাষণ শুনতে আসব বলে কথা দিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম।

সন্ধ্যার সময় জালিয়ানওয়ালা বাগ লোকে থৈ থৈ করছিল। আমি একটু আগে-ভাগেই এসেছিলাম বলে স্টেজের কাছে জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম। হাত তালির সঙ্গে সঙ্গে গুলাম আলী স্টেজের ওপর এসে দাঁড়াল। সাদা ধবধবে খাদির পোষাক পরে থাকার জন্যে তাকে আরও সুন্দর এবং আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল। যে মেজাজের কথা আমি আগে বলেছি সেই মেজাজ বারবার ঝিলিক দিচ্ছিল বলে তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলছিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সে এক নাগাড়ে বলে চলল,—এর মধ্যে কয়েকবার আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল। শুনতে শুনতে দু'একবার আমার মনে হয়েছিল আমি বোমার মতো ফেটে পড়ি। খুব সম্ভব সেই

সময় আমার মনে হয়েছিল কেঁটে গেলে হিন্দুস্থান স্বাধীন হয়ে যাবে।

একমাত্র খোদাই জানে কত বৎসর কেটে গিয়েছে। সেই সময়কার ভাবনা এবং ঘটনাগুলি কিভাবে প্রবাহিত হয়েছিল তা এত বৎসর পর হুবহু তুলে ধরা খুবই মুশকিল। কিন্তু এই গল্প লেখার সময় যখন গুলাম আলীর ভাষণের কথা মনে পড়ছে তখন গোটা একটা তারুণ্য যেন আমার সামনে ভেসে উঠছিল। রাজনীতে সেই তারুণ্য ছিল পবিত্র, ছিল সাচ্চা নির্ভীকতা। তা যেন পথ চলতি কোন মেয়ের হাত ধরে বলেছিল, 'আমি তোমাকে পেতে চাই।' কিন্তু পরক্ষণেই যেন আইনের নাগপাশে গ্রেফতার হয়ে গেল। এই ভাষণের পর আমার ওর আরও দু-একটি ভাষণ শোনার সুযোগ হয়েছিল। ওর আধা-পাকা পাগলামী উঠতি যৌবন বাচালতা দাড়ি-গোঁফহীন আহ্বান, যে আহ্বান আমি গুলাম-আলীর কণ্ঠে শুনেছিলাম, তার সামান্যতম গুঞ্জনও আজ আর শোনা যায় না। এখন যে ভাষণ শুনি তা হচ্ছে ঠাণ্ডা গম্ভীরতায় ভরপুর পুরনো রাজনীতি এবং কাব্যিক কাব্যিক ভাবে জড়ানো।

আসলে সেই সময় দুটি পার্টিই কাঁচা ছিল। সরকারও কাঁচা ছিল—প্রজাও। ফলে কেউ কাউকে পরওয়া না করে পরস্পরের খটাখটি লেগেছিল—সরকার জেলখানার গুরুত্ব না বুঝে লোককে বন্দী করে চলেছিল—তারাও ধরা দিচ্ছিল। জেলখানায় যাওয়ার আগে জেলখানায় কেন যাচ্ছে তাও জানত না।

এ এক ধোকা ছিল, সেই ধোকার মধ্যে আগুনের এক আভাসও ছিল। মানুষ স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলছিল—নিভছিল, আবার জ্বলে উঠছিল। এই জ্বলা আর নেভা, নেভা আর জ্বলা গোলামীর বৈরাগ্য উদাস এবং হাই-তোলার মধ্যে এক উষ্ণ কম্পন সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

গুলাম আলীর ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা জালিয়ানওয়ালা বাগ জোর জোর তালি এবং শ্লোগানের আগুনে জ্বলে উঠেছিল। ওর মুখ জ্বল জ্বল করছিল। আমি যখন আলাদাভাবে ওর সঙ্গে দেখা করলাম এবং ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যে ওর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চাপ দিলাম তখন ও থরথর করে কাঁপছিল। ওর এই উষ্ণ কম্পন ওর উজ্জ্বল মুখের

চেয়েও উত্তপ্ত ছিল। ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। ওর দুই চোখে উৎসাহ-দীপ্ত ভাবনার দমক ছাড়াও এক শ্রান্ত চাহনি আমি দেখতে পেলাম—যেন ও কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার হাত থেকে নিজের হাতকে ছাড়িয়ে নিয়ে ও চামেলি ঝাড়ের নীচে এগিয়ে গেল।

চামেলি ঝাড়ের কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পরনে সাদা ধবধবে খদ্দের শাড়ি।

পরের দিন আমি বুঝতে পারলাম শাহজাদা গুলাম আলী প্রেমের ফাঁদে আটকা পড়েছে। আমি যে মেয়েটিকে চামেলি ঝাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম তার সঙ্গে ও প্রেম করছিল। এ এক তরফা প্রেম ছিল না, নিগারও ওর প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছিল। নিগার নাম থেকে বোঝা যায় সে ছিল মুসলমান। অনাথ। মেয়েদের হাসপাতালে নার্সের কাজ করত, খুব সম্ভব অমৃতসরে প্রথম মুসলমান মেয়ে যে বোরখা ফেলে দিয়ে কংগ্রেসের আন্দোলন যোগ দিয়েছিল।

খদ্দরের কাপড় পড়ে, কিছুটা কংগ্রেসের সরগরমে যোগ দেওয়াতে এবং হাসপাতালে কাজ করার দরুন নিগারের ইসলামী প্রকৃতি অর্থাৎ সেই উগ্র জিনিস যা মুসলমান মেয়েদের স্বভাবে লীন হয়ে আছে তা কিছুটা পরিমাণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল—কিছুটা নম্র হয়ে গিয়েছিল।

দেখতে ও সুন্দর ছিল না, কিন্তু নারীত্বের অনিন্দ্যসুন্দরতা, নম্রতা, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধায় ও ছিল ভরপুর। আদর্শ হিন্দু মেয়েদের যে স্বভাব তা নিগারের মধ্যে অল্প-বিস্তর ঝিলিক দিচ্ছিল এবং যা তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে রক্তের উষ্ণতা সঞ্চার করার জন্যে রঙে ভরে দিয়েছিল। খুব সম্ভব নিগারকে নিয়ে আমি সেই সময় এমন করে ভাবিনি। কিন্তু এখন লেখার সময় যখন আমি নিগারকে নিয়ে কল্পনা করছি তখন ওকে নমাজ আর আরতীর এক হৃদয়-সঙ্গম বলে আমার মনে হচ্ছে।

ও শাহজাদা গুলাম আলীর পূজা করত আর শাহজাদা ওর জন্যে জান দিয়ে দিত। নিগারকে নিয়ে আমি যখন ওর সঙ্গে কথা বলি তখন জানতে পারি কংগ্রেসের আন্দোলনের জন্যে ওদের দু'জনের পরিচয় হয়। আর পরিচয়ের অল্প দিনের মধ্যে ওরা দু'জন মনের মানুষ হয়ে যায়।

গুলাম আলীর ইচ্ছা ছিল জেলে যাওয়ার আগে ও নিগারকে বিয়ে করে। আমার এখন ঠিক মনে নেই, জেলে যাওয়ার আগে ও কেন বিয়ে করতে চেয়েছিল। জেল থেকে ফিরে এসেও তো বিয়ে করতে পারত। সেই সময় তো খুব বেশী দিন জেল হত না। খুব কম হলে তিন মাস আর বেশী হলে এক বৎসর। অনেককে তো পনেরো-বিশ দিন পরেই ছেড়ে দেওয়া হত, যাতে অন্য কয়েদীদের জায়গার অভাব না হয়। যাই হোক ওর নিজের ইচ্ছা নিগারের ওপরও প্রভাব ফেলেছিল এবং নিগারও সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল। শুধু মাত্র বাবাজীর কাছে গিয়ে আশীর্বাদ নেওয়াটাই বাকী ছিল।

বাবাজী সম্পর্কে আপনি যাই জানুন না কেন, তাঁর ছিল অসাধারণ ক্ষমতা। শহরের বাইরে লাখপতি সরাফ হরিরামের জাঁকজমক বাড়িতে তিনি উঠতেন। পাশের এক গ্রামে তিনি যে আশ্রম করেছিলেন সাধারণত সেখানেই থাকতেন, কিন্তু অমৃতসরে এলে তিনি হরিরাম সরাফের বাড়িতে থাকতেন। আর বাবাজী এলেই তাঁর ভক্তদের কাছে এই বাড়ি পবিত্র হয়ে উঠত। সারাদিন দর্শনপ্রার্থীদের ভিড়ে জমজমাট বেঁধে থাকত। প্রতিদিন বিকালের দিকে আমগাছের শীতল ছায়ায় একটা বেঞ্চের ওপর বসে তিনি জনসাধারণকে দর্শন দিতেন এবং আশ্রমের জন্যে চাঁদা তুলতেন। তারপর ভজন ইত্যাদি শুনে প্রতিদিন তাঁর মতামত নিয়ে এই সভা ভেঙে দেওয়া হত।

বাবাজী খুব পর উপকারী ঈশ্বর বিশ্বাসী, বিদ্বান এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ এবং অচ্ছুৎ—প্রত্যেকেই তাঁকে মান্য করত এবং নিজেদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

রাজনীতির ব্যাপারে বাবাজীর কোন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু সবাই জানত পাঞ্জাবের সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁরই ইচ্ছায় শুরু হত এবং তারই ইচ্ছায় খতম হত।

সরকারের কাছেও এই ব্যাপারটা ছিল অস্পষ্ট। এ এমন এক রাজনৈতিক চাল ছিল যে ব্রিটিশ সরকারের বড় বড় রাজনীতিকরাও এর কারণ খুঁজে পায়নি। বাবাজীর পাতলা ঠোঁটের এক বলক হাসির হাজার অর্থ

হত। কিন্তু তিনি যখন স্বয়ং সেই হাসির এক নতুন অর্থ ব্যাখ্যা করতেন তখন ভক্ত-জনরা আরও বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়ত।

অমৃতসরে এই যে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল এবং ঝপাঝপ গ্রেফতার হচ্ছিল এর পেছন আর যাই-ই থাক বাবাজীর ইচ্ছা যে কাজ করছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তিনি যখন জনসাধারণকে দর্শন দিতেন তখন তিনি সারা পাঞ্জাবের আন্দোলন এবং সরকারের নিত্য নতুন কঠোরতা সম্পর্কে ফোঁকলা মুখে ছোট্ট-খুব ছোট্ট একটা শব্দ ছুঁড়ে দিতেন। আর হোমরা-চোমরা নেতারা সঙ্গে সঙ্গে তা নিজেদের গলায় তাবিজ করে ঝুলিয়ে দিতেন।

লোকে বলত, তার চোখে চুম্বকের মতো এক অসাধারণ শক্তি ছিল। তার কণ্ঠেস্বরে ছিল যাদু। তার মস্তিষ্ক এত ঠাণ্ডা এবং উপস্থিত বুদ্ধিতে ঠাসা ছিল যে, তাকে অশ্লীল থেকে অশ্লীলতর গালিগালাজ আর তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর ব্যঙ্গ করলেও তুতুর জন্যেও তিনি উত্তেজিত হতেন না। বিরোধীদের কাছে তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল এক প্রচণ্ড ত্রাসের জিনিস। অমৃতসরে বাবাজীর অনেক মিছিল বের হয়েছিল। কিন্তু আমিই বোধহয় একমাত্র মানুষ ছিলাম, যে অনেক নেতাকে দেখেছিলাম, একমাত্র তাঁকেই দূর থেকে বা কাছে থেকে দেখিনি। তাই যখন গুলাম আলী তাঁকে দর্শন করার জন্যে এবং বিয়ের ব্যাপারে তাঁর মতামত নেওয়ার কথা আমাকে বলল, তখন আমি তাকে বললাম তাদের দু জনের সঙ্গে আমিও যাব।

বাবাজী স্নান-টান সেরে এবং ভোরের প্রার্থনা শেষ করে এক সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যার কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত শুনছিলেন। চীনা মাটির সাদা ধবধবে টাইল বসোনো মেঝের ওপর খেজুরের চাটাই বিছিয়ে বাবাজী বসে ছিলেন। এক ধারে পাশ বালিশ পড়ে ছিল। কিন্তু সেই পাশ বালিশে তিনি কোন হেলান দেননি।

বাবাজী যে চাটায়ের ওপর বসে ছিলেন সেই চাটাই ছাড়া ঘরে আর কোন ফার্নিচার ছিল না। ঘরের এক কোণ থেকে আরেক কোণ পর্যন্ত সাদা টাইলগুলো ঝকঝক করছিল। যে ব্রাহ্মণ কন্যা জাতীয় সঙ্গীত গাইছিল তার হালকা গোলাপী মুখশ্রীকে এই টাইল-গুলোর ঝকমক আরও সুন্দর করে তুলেছিল।

বাবাজীর বয়স কম পক্ষে সত্তর-বাহাত্তর হবে। এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও (তিনি গেরুয়া রঙের একটা ছোট লুঙ্গি পরেছিলেন) বয়সের কোন ছাপ তাঁর ওপর পড়েনি। তাঁর শরীরের এক অদ্ভুত ধরণের ঔজ্জ্বল্য এবং লাবণ্য ছিল। পরে আমি জানতে পারি প্রতিদিন স্নান করার আগে সারা গায়ে তিনি অলিবওয়েল মালিশ করতেন।

শাহাজাদা গুলাম আলীর দিকে তাকিয়ে তিনি মুচকি হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকেও এক ঝলক তাকালেন। এবং আমাদের তিন জনের সেলামের উত্তরে তিনি তেমনি মুচকি হেসে ইশারায় আমাদের বসতে বললেন।

চেতনার চশমায় আমি যখন সেই ছবি সামনে আনতাম তখন মজার ব্যাপার না হয়ে বরং ভাবনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। খেজুরের চাটাই এর ওপর এক অর্ধনগ্ন বৃদ্ধ যোগীর মতো বসে আছেন। তাঁর বসার রঙ, তাঁর দেহের প্রতিটি শিরা থেকে এমন এক শান্তিতে ভরপুর সন্তোষ—এক নিশ্চিত বিশ্বাস জাহির হচ্ছিল যে দুনিয়া তাঁকে যেখানে বসিয়েছে সেখান থেকে কোন ভূমিকম্পই ছিটকে ফেলে দিতে পারবে না।

আর তাঁর কাছ থেকে সামান্য কিছুটা দূরে ফুটেছিল কাশ্মীরের এক পাহাড়ী কলি। কিছুটা সেই প্রবীণের নৈকট্যকে সম্মান দেওয়ার জন্যে, কিছুটা জাতীয় সঙ্গীত আর কিছুটা নিজের ভরাট যৌবনের জন্যে সে ঝুঁকে ছিল। জাতীয় সঙ্গীত ছাড়াও সাদা শাড়ির ভেতর থেকে সে তার যৌবনের সঙ্গীতকে উচ্চগ্রামে গাইতে চাইছিল। যে ভরাট যৌবন এই প্রবীণের নৈকট্যকে আপ্যায়িত করার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ তার যৌবনের শক্তি দিয়ে সৎকার করার জন্যে অবনত হতে চাইছিল—সেই যৌবন তাকে ঘাড় ধরে জীবনের দাউ দাউ আগুনে লাফিয়ে পড়ার জন্যে উৎসাহ যোগাচ্ছিল। তার হালকা গোলাপী চেহারা থেকে, তার বড় বড় কালো চঞ্চল চোখ থেকে, তার খদ্দরের খসখসে ব্লাউজে-ঢাকা উচ্ছলিত বুক থেকে সেই বৃদ্ধ যোগীর গভীর বিশ্বাস এবং সন্তোষের বিরুদ্ধে এক নীরব আর্তনাদ উচ্চারিত হচ্ছিল। যেন বলেছিল, এস, আমি এখন যেখানে আছি হয় সেখান থেকে আমাকে টেনে নীচে নামাও, না হয় আমাকে ওপরে নিয়ে চল।

আমরা তিনজন একধারে সরে বসেছিলাম—আমি, নিগার আর

শাহজাদা গুলাম আলী। আমি চুপচাপ বোকার মতো বসে ছিলাম। বাবাজীর ব্যক্তিত্বে যেমন আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম, তেমন ব্রাহ্মণ কন্যার অনন্য সৌন্দর্যেও। মেঝের ঝকমকে ষ্টাইল গুলো এবং তার ওপর বিছানো খসখসে চাটাইও আমাকে আকর্ষিত করেছিল। একেকবার মনে হচ্ছিল এই রকম একটা টাইল বসানো বাড়ি যদি আমি পেতাম তাহলে কত ভালোই না হত।

একেকবার মনে হচ্ছিল এই ব্রাহ্মণ কন্যা আমাকে আর কিছু করতে না দিক অন্তত একবার তার চোখের ওপর আমার চুম্বনের স্পর্শ নিক। এই ইচ্ছা আমার সমস্ত শরীরে এক থরথর কম্পন সৃষ্টি করল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়ির ঝির কথা মনে হল, যার সঙ্গে আমার সেই সম্পর্ক এখনও সজীব হয়ে আছে। মনে হচ্ছিল ওদের দু'জনকে এখানে ফেলে রেখে আমি সোজা বাড়ি যাই, আর সবার নজর বাঁচিয়ে ওকে ওপরের বাথরুমে নিয়ে গিয়ে···কিন্তু যখন বাবাজীর দিকে তাকালাম এবং কানে জাতীয় সঙ্গীতের উদ্দীপক শব্দ গুঞ্জরিত হয়ে উঠল তখন আরেক ধরণের কম্পন আমার মধ্যে শুরু হল। মনে হল কোথাও থেকে যদি একটা পিস্তল পেয়ে যাই তবে সিভিল লাইনসে গিয়ে ইংরেজদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।

আমার মাতা এই বৃদ্ধর পাশেই নিগার আর শাহজাদা বসেছিল। ভালোবাসার দুটি হৃদয়—ভালোবাসায় একাকী হাঁফাতে হাঁফাতে খুব সম্ভব উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। আর তাই তারা তাড়াতাড়ি একজন আর একজনের প্রেমের রঙ দেখার জন্যে এক হয়ে যেতে চাইছিল। অন্য ভাষায় বলা যায়, তারা তাদের একমাত্র রাজনৈতিক পিতা বাবজীর কাছ থেকে বিয়ে করার জন্যে অনুমতি নিতে এসেছিল। ওপর ওপর আর যাই থাক তাদের দু'জনের মনে সেই সময় রাষ্ট্রিয় সঙ্গীতের জায়গায় তাদের জীবনের সুন্দরতন এক অশ্রুত সঙ্গীত গুমগুন করছিল।

সঙ্গীত শেষ হলে বাবাজী খুব স্নেহ বিগলিত ঢঙে ব্রাহ্মণ কন্যাকে হাত উঠিয়ে আশীর্বাদ করলেন। এবং মুচকি হেসে নিগার এবং গুলাম আলীর দিকে তাকালেন। আমাকেও এক ঝলক তাকিয়ে দেখে নিলেন।

খুব সম্ভব পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে গুলাম আলী নিগারের নাম বলতে চাইছিল। কিন্তু তার আগেই বাবাজী মিষ্টি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,

"শাহাজাদা, তুমি এখনও গ্রেফতার হওনি?"

গুলাম আলী হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে না।"

বাবাজী কলমদানী থেকে একটা পেন্সিল তুলে দিয়ে লিখতে লিখতে বললেন, "কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি গ্রেফতার হয়ে গিয়েছ।"

গুলাম আলী তার এই কথার অর্থ ঠিক ধরতে পারল না। বাবাজী এক ঝলক ব্রাহ্মণীর দিকে তাকিয়ে নিগারের দিকে ইশারা করে বললেন, "নিগার আমাদের শাহজাদাকে গ্রেফতার করে ফেলেছে।"

লজ্জায় নিগার লাল হয়ে উঠল। গুলাম আলী আশ্চার্য হা হয়ে রইল, আর ব্রাহ্মণীর গোলাপী মুখের ওপর আশীর্বাদ-ভরা এক চমক খেলে গেল। ও গুলাম আলী আর নিগারের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন সেই তাকানোর অর্থ ভালোই হয়েছে।

বাবাজী আর একবার ব্রাহ্মণীর দিকে তাকালেন। এবং বললেন, "এরা আমার কাছে বিয়ের অনুমতি নিতে এসেছে—কমল, তুমি কবে বিয়ে করছ?"

জানলাম ব্রাহ্মণীর নাম কমল। হঠাৎ বাবাজীর প্রশ্ন শুনে ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। ওর গোলাপী মুখ ম্লান হয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে ও বলল, "আমি তো আপনার আশ্রমে যাচ্ছি।"

কমলের এই উত্তরের মধ্যে কেমন একটা করুণভাবে জড়িয়ে ছিল। যে করুণতা—ব্যথা বাবাজীর হুশিয়ার মন সঙ্গে সঙ্গে নোট করে নিল। ওর দিকে তাকিয়ে বাবাজী যোগীর মতো একটু মুচকি হাসলেন। হেসে গুলাম আলী আর নিগারকে বললেন, "তা তোমরা দু'জনে দু'জনে সব ঠিক করে ফেলেছ?"

দু'জনে অস্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দিল, "জী হাঁ।"

বাবাজী ভাসাভাসা চোখে তাদের দিকে তাকালেন, "মানুষ যেমন ফয়সালাও করতে পারে তেমনি তা আবার পালটাতেও পারে।"

এই প্রথম গুলাম আলী বাবাজীর গম্ভীর অটলতার বিরুদ্ধে—না, গুলাম আলী নয় তার দৃঢ় এবং সমগ্র কণ্ঠে উত্তর দিল, "যদি ফয়সালা কোন কারণে পালটানো হয় তবুও আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকব।"

বাবাজী তাঁর চোখ বন্ধ করে যেন মহাশূন্যের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

এই প্রশ্নে গুলাম আলী একটুও ঘাবড়াল না। নিগারের সঙ্গে তার যে সাচ্চা প্রেম ছিল তা যেন বলে উঠল, "বাবাজী, আমি হিন্দুস্থানে আজাদী আনার জন্যে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা যদি কোন কারণে মুলতবি রাখার চেষ্টা হয় তাতে কি আসে যায়, আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা তো নড়চড় হবার নয়।"

যেহেতু আমি সেখানে বসেছিলাম তাই বাবাজী এই বিয়ে নিয়ে তর্ক করা উচিত মনে করলেন না। তিনি হেসে দিলেন। তাঁর এই হাসিও তাঁর অন্য হাসিরই মতো। যে হাসির মানে একেক জন একেক ভাবে অর্থ করবে। যদি বাবাজীকে এই হাসির অর্থ জিজ্ঞেস করা হত আমার বিশ্বাস তবে তিনি আমাদের প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন অর্থ করে দিতেন।

এই হাজারো অর্থ করা মুচকি হাসি নিজের পাতলা পাতলা ঠোঁটের ওপর আর একটু প্রসারিত করে বাবাজী নিগারকে বললেন, "নিগার তুমি আমার আশ্রমে আস, অল্প দিনের মধ্যেই শাহজাদা গ্রেফতার হয়ে যাবে।"

নিগার মৃদু কণ্ঠে বলল, "জী আচ্ছা।"

এরপর বাবাজী বিয়ের কথা আর না তুলে জালিয়ানওয়ালা বাগের কাম্পের যে সরগরম সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে গুলাম আলী, নিগার আর কমল গ্রেফতার, মুক্তি, দুধের লস্সি এবং তরি-তরকারি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। আর আমি বেকুবের মতো চুপচাপ বসে ভাবছিলাম বাবাজী বিয়ের অনুমতি দিতে এত কুণ্ঠিত কেন। গুলাম আলী আর নিগারের ভালোবাসাকে কি বাবাজী সন্দেহের চোখে দেখেন? গুলাম আলীর সততার ওপর তাঁর কি সন্দেহ আছে? নিগারকে কি তার আশ্রমে এই জন্যেই আমন্ত্রিত করছেন যে ঐখানে থাকলে সে তার স্বামীকে—যে গ্রেফতার হতে চলেছে তাকে ভুলে যাবে?··কিন্তু বাবাজী কমলকে কেন জিজ্ঞেস করলেন, "কমল তুমি কবে বিয়ে করছ?" কমল কেন বলল,—"আমি আপনার আশ্রমে যাচ্ছি।"

কেন আশ্রমে কি নারী এবং পুরুষ বিয়ে করে না? আমার মন এক অদ্ভুত সমস্যায় ফেঁসে গেল। সেখানে এই ধরণের কোন ব্যাপার আছে যে পাঁচশ' স্বয়ং সেবকের জন্যে স্বয়ং বেবিকারা চাপাটি তৈরী করে? ক'টা

উনুন আছে? আর তা কত বড়? কেন এমন কি হতে পারে না বিরাট একটা উনুন বানিয়ে তার ওপর বিরাট এক তাওয়া রেখে ছ'জন স্বয়ং সেবিকা একই সঙ্গে রুটি বানায়?

আমি ভাবছিলাম ব্রাহ্মণ কন্যা কমল আশ্রমে গিয়ে কি শুধু বাবাজীকে জাতীয় সঙ্গীত এবং ভজন শোনাবে? আমি আশ্রমে পুরুষ স্বয়ং সেবক দেখেছি। তারা প্রত্যেকে সেখানকার কায়দা অনুযায়ী স্নান করত, ভোরে ঘুম থেকে উঠে দাতন করত, বাইরের খোলা হাওয়াতে থাকত, ভজন গাইত তবু তাদের জামা-কাপড় থেকে ঘামের গন্ধও আসত। অনেকের দাঁতে আবার বিশ্রী গন্ধ। আর খোলা হাওয়ায় থাকার দরুণ মানুষের মধ্যে যে খুশী-খুশী ভাব দেখা যায় তা তাদের মধ্যে একেবারেই দেখা যেত না।

বেঁকে যাওয়া, পাংশু মুখ, গর্তে বসা চোখ, ভীরু ভীরু চেহারা—গরুর নিংরানো বাটের মতো চুপসে-যাওয়া আশ্রমের এই নিষ্প্রাণ লোক-গুলিকে আমি কয়েকবার জালিয়ানওয়ালা বাগে দেখেছি। বারবার মনে হয়েছে এরা কি ধরণের মরদ যাদের গা থেকে ঘামের গন্ধ আসে। আর এই ব্রাহ্মণী, যার শরীর দুধ মধু এবং কেশর খেয়ে তৈরী,—তাকে এই মানুষগুলি পিচুটি-ভরা চোখে চাটবে? এরা কি ধরণের মরদ যারা তাদের মুখের কটু গন্ধ নিয়ে সুগন্ধে ভরপুর এই সব নারীদের সঙ্গে কথা বলবে? কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, না, হয়তো হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা এই সব জিনিসের অনেক ওপরে।

আমি এই "হয়তো' দেশভক্তি এবং আজাদীকে আমার সমস্ত চেতনা দিয়েও ঠিক বুঝতি পারিনি, কারণ আমি নিগারের কথা ভাবছিলাম। নিগার আমার পাশে বসে বাবাজীকে বলছিল শালগম সেদ্ধ হতে দেরী লাগে। কোথায় শালগম আর কোথায় বিয়ে, যে বিয়ের জন্যে ও আর গুলাম আ[illegible]র কাছে অনুমতি নিতে এসেছিল।

আমি নিগার এবং আশ্রম সম্পর্কে ভাবছিলাম। আশ্রম আমি দেখিনি, কিন্তু আশ্রম, স্কুল, জখায়েতখানা, তীর্থস্থান, দরগাহ প্রভৃতি সম্পর্কে

আমার বিরূপতা আছে। কেন তা আমি জানি না।

আমি কয়েকটি অন্ধ স্কুল, অনাথ আশ্রমের ছেলে এবং সেখান কার পরিচালকদের দেখেছি। রাস্তার ওপর তাদের সারি বেঁধে ভিক্ষা করতে দেখেছি। জমায়েতখানা আর দরগাহ দেখেছি। দেখেছি তাদের হাঁটুর ওপর ওঠানো পায়জামা। ছোটদের মাথার ওপর বড় বড় মেহরা, আর যারা বয়সে বড় তাদের মুখে এক রাশ ঘন দাড়ি, যে দাড়ি ক্রমে বেড়েই চলেছে। আর গালের ওপর মোটা মোটা মোলায়েম চুল। নামাজ পড়তে চলেছে। মুখের ওপর কেমন একটা নিষ্ঠুর ভাব যে নিষ্ঠুর ভাব সহজেই চোখে পড়ে।

নিগার ছিল নারী। হিন্দু মুসলমান শিখ বা খ্রীষ্টান নারী নয়—ও ছিল শুধুমাত্র নারী। না, ও ছিল নারীর সেই প্রার্থনা, যে প্রার্থনা সাচ্চা হৃদয়ে পেতে চায় তাকে, যে তাকে ভালোবাসে আর যাকে সে নিজে চায়।

আমার মাথায় ঢুকছিল না বাবাজীর আশ্রমে,—যেখানে প্রতিদিন এক বিশেষ ঢঙে প্রার্থনা হয় সেখানে এই মেয়েরা কেমন করে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করবে। কারণ যারা নিজেরাই এক একটি প্রার্থনা।

আমি এখন যখন বাবাজী, নীগার, গুলাম আলী, ব্রাহ্মণী আর অমৃতসরের সেই পরিবেশ, যা স্বাধীনতা আন্দোলনের এক রঙীন নেশায় মেতেছিল ভাবি, তখন তা স্বপ্ন বলে মনে হয়। এমন এক স্বপ্ন, যে স্বপ্ন একবার দেখলে আর একবার দেখার জন্যে মন আকুল হয়ে ওঠে।

বাবাজীর আশ্রম আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি, কিন্তু যে বিরূপ ধারনা আমার আগে ছিল তা এখনও আছে।

এ সেই জায়গা যেখানে দুর্ভাগ্যকে সম্বল করে মানুষ এক সারিতে হেঁটে চলে। আমার কাছে এর কোন দাম আছে বলে মনে হয়নি। আজাদী নিশ্চয়ই লাভ করতে হবে। আর তা লাভ করার জন্যে যারা প্রাণ দান করে তাদের আমি বুঝতে পারি। কিন্তু তার জন্যে সেই হতভাগাদের যদি তরবারীর মতো ঠাণ্ডা এবং নির্জীব বানানো হয়, তাবে তাকে আমি কি বলব? এ আমার বুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে।

ঝুপরিতে থাক, আরাম আয়েশের বদলে কঠিন পরিশ্রম করা, ভগবানের

গুন কীর্তন করা, জাতীয় স্লোগান দেওয়া এ সমস্ত কিছুই নিশ্চয়ই সঠিক। কিন্তু মানুষের যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য এবং ভালবাসা-বোধ তাকে ধীরে ধীরে হত্যা করা কেমন ব্যাপার। এরা কেমন মানুষ যাদের মধ্যে সৌন্দর্যের আকাঙ্খা এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার ছটফটানি নেই। এ ধরণের আশ্রম মাদ্রাসা আর স্কুলের সঙ্গে মুলোর খেতের পার্থক্য কোথায়?

বাবাজী অনেকক্ষণ ধরে গুলাম আলী এবং নিগারের সঙ্গে জালিয়ান-ওয়ালা বাগের সরগরম নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। তারপর তিনি, যারা তাদের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যায়নি সেই ভালোবাসার যোটক—গুলাম আলী আর নিগারকে বললেন, পরের দিন তিনি জালিয়ান ওয়ালা বাগে যাবেন, আর তাদের স্বামী স্ত্রীর মর্যাদা দেবেন।

গুলাম আলী আর নিগার খুব খুশী হয়েছিল। এর চেয়ে বেশী তাদের আর কি সৌভাগ্য হতে পারে। কারণ, বাবাজী স্বয়ং তাদের বিয়েতে অংশ নেবেন। গুলাম আলী আমাকে পরে বলেছিল ও এত খুশী হয়েছিল যে, যে মুহূর্তেও এ কথা শুনল, মনে হচ্ছিল যেন ভুল শুনছে। কারণ, বাবাজীর সরু সরু টেরা-বেঁকা হাতের আলতো স্পর্শ এক ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হত। এত বড় একজন শক্তিধর মানুষ, যিনি শুধুমাত্র ঘটনার সংযোগে কংগ্রেসের ডিকটেটর হয়েছেন, তিনি একজন সাধারণ মানুষের জন্যে জালিয়ানওয়ালা বাগে যাবেন—তার বিয়েতে অংশগ্রহণ করবেন। এ ঘটনা ভারতবর্ষের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় লাল অক্ষরে লেখা থাকবে।

সন্ধ্যা ছ'টায় যখন জালিয়ানওয়ালা বাগের নাইট কুইন ফুলের ঝড়-গুলো তার গন্ধকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে উসখুস করছিল, আর স্বয়ং দেব-করা যখন বর কনের জন্যে এক ছোট্ট সামিয়ানা খাঁটিয়ে চামেলি গাঁদা এবং গোলাপ দিয়ে সাজাচ্ছিল তখন বাবাজী জাতীয় সঙ্গীতের গায়িকা সেই ব্রাহ্মণী তাঁর সেক্রেটারী এবং লালা হরিরাম সরাফের সঙ্গে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এলেন। সদর ফটকের কাছে হরিরামের গাড়ি এসে যখন থামল শুধুমাত্র তখনই সবাই জানতে পারল তিনি জালিয়ানওয়ালা বাগে এসেছেন।

আমিও সেখানে ছিলাম। স্বয়ং সেবিকারা অন্য আর একটা তাঁবুতে নিগারকে সাজাচ্ছিল। গুলাম আলী তেমন কোন সাজ-সজ্জা করেনি। সারা দিন সে শহরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে স্বয়ং সেবকদের খাবার-দাবার নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। কথাবার্তা শেষ হয়ে গেলে এক মুহূর্তের জন্য সে নিগারের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলল। তারপর যতটুকু আমি জানি সে ওপরতলার কর্মকর্তাদের শুধু বলল, বিয়ের পার্বন শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আর নিগার দু'জনে ঝাণ্ডা তুলে ধরবে।

বাবাজীর আসার খবর যখন গুলাম আলী পেল তখত সে কুয়োর কাছে দাঁড়িয়েছিল। খুব সম্ভব সেই সময় আমি তাকে বলেছিলাম, গুলাম আলী তুমি কি জান, যখন জালিয়ানওয়ালা বাগে গুলি চলেছিল তখন এ কুয়ো মৃতদেহে ভরে গিয়েছিল। আজকে সবাই এর জল পান করে। এর জল দিয়েই এই বাগানের সমস্ত ফুল গাছ সিঞ্চন করা হয়। মানুষ এখানে এসে সেই ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যায়। জলের একটি ফোটাতেও রক্তের নোনতা স্বাদ নেই, ফুলের একটি পাঁপড়িতেও রক্তের লালিমা নেই—এ কেমন কথা ?

আমার বেশ মনে আছে, শাহজাদাকে এই কথাকটি বলে আমি সেই বাড়ির জানালার দিকে তাকালাম। বলা হয় এই বাড়ির জানালার কাছে বসে ন' বৎসরের এক কিশোরী মজা দেখছিল। মজা দেখতে দেখতেই জেনারেল ডায়ারের গুলিতে সে বিদ্ধ হয়েছিল। তার বুক থেকে প্রবাহিত সেই রক্তের ধারা আজ পুরানো প্রাচীরের ওপর ম্লান হয়ে চলেছে।

এখন রক্ত এত সস্তা হয়ে গিয়েছে যে, রক্ত দেওয়া আর নেওয়া কোন কঠিন ব্যাপার নয়। আমার মনে আছে তখন আমি তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। জালিয়ানওয়ালা বাগের এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ছ-সাত মাস পর আমাদের মাস্টার মশাই ক্লাশের সমস্ত ছেলেদের সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় জালিয়ানওয়ালা বাগ বাগান ছিল না—ছিল উজাড়, নিস্তব্ধ। আর উঁচু-নীচু এক টুকরো জমি—যে জমিতে মাটির ছোট্ট-বড় ঢেলায় হোঁচট খেতে খেতে আমরা এগুচ্ছিলাম। হঠাৎ মাটির ছোট্ট একটি ঢেলায় খুব সম্ভব পানের পিকের বা অন্য কিছুর ছাপ

আমাদের মাস্টার মশায় সেই ঢেলাটা উঠিয়ে নিয়ে বললেন, "দেখ, এর ওপর এখনও আমাদের শহীদদের রক্তের দাগ লেগে আছে।"

এই কাহিনী যখন লিখে চলেছি তখন আমার স্মৃতির পর্দায় অসংখ্য ছোট ছোট কথা এসে ভিড় করছে। কিন্তু আমাকে তো নিগার আর গুলাম আলীর বিয়ের কাহিনী বলতে হবে।

গুলাম আলী যখন খবর পেল বাবাজী এসে গিয়েছেন, তখন সে দৌড়ে সমস্ত স্বয়ং সেবকদের একত্রিত করল। তারা ফৌজি ঢঙ-এ বাবাজীকে সেলুট করল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তিনি আর গুলাম আলী সমস্ত ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। এর মধ্যে বাবাজী, যাঁর বিনোদ-প্রিয়তা সম্পর্কে সবাই জানত, তিনি স্বয়ং সেবিকা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় দু-চারটি হাসির কথাও বললেন।

আশে-পাশের বাড়িগুলোতে যখন আলো জ্বলে উঠতে লাগল এবং জালিয়ানওয়ালা বাগে অস্পষ্ট অন্ধকার ছেয়ে গেল তখন স্বয়ং সেবিকারা একসঙ্গে গজল গাইতে শুরু করে দিল। কয়েকজনের কণ্ঠ সুরেলা ছিল, বাকী সবার বেসুরো। কিন্তু মিলিত এই সুরের পরিবেশ খুব সুন্দর ছিল। বাবাজী চোখ বন্ধ করে শুনছিলেন। কম করেও হাজার খানেক মানুষ চত্তরের চারদিকে মাটিতে বসে ছিল। ভজন যারা গাইছিল সেই সব মেয়েরা ছাড়া আর সবাই চুপ ছিল।

চত্তরে একজন মৌলভী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। কোরান থেকে তিনি কয়েকটি বয়াত পড়লেন, যে বয়াত গুলি সাধারণত বিয়ের সময় পড়া হয়। বাবাজি চোখ বন্ধ করে নিলেন। নিকার পর্ব শেষ হয়ে গেলে বাবাজি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বর কনেকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর চারদিক থেকে যখন ছুহারা বর্ষণ হতে লাগল তখন তিনি শিশুর মতো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে দশ পনেরোটা ছুহারা কুড়িয়ে পাশে রাখলেন।

নিগারের এক হিন্দু বান্ধবী লাজুক লাজুক হেসে গুলাম আলীকে একটা ছোট্ট কৌটো দিয়ে কি যেন বলল। গুলাম আলী কৌটো খুলে নিগারের সাদা সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে ভরিয়ে দিল। জালিয়ানওয়ালা বাগের রক্তিম পরিবেশ আর একবার জোর জোর তালির আওয়াজে ভরে উঠল।

এই তালির আওয়াজের মধ্যে বাবাজী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

নাইট কুইন আর চামিলির সোঁদা সোঁদা গন্ধ মিলে মিশে সন্ধ্যার ফুরফুরে হাওয়ায় নাচছিল। খুব মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল বাবাজীর কণ্ঠ আজ আরও মিষ্টি ছিল। গুলাম আলী আর নিগারের বিয়েতে বাবাজী নিজের হৃদয় আরো খুশিতে ভরিয়ে তোলার পর বললেন, "এই দুই তরুণ-তরুণী আগের চেয়ে আরও বেশী উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে তাদের দেশ এবং জাতির সেবা করবে। কারণ বিয়ের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী এবং পুরুষের সত্যিকারের বন্ধুত্ব। তারা-নিগার আর গুলাম আলী পরস্পরের বন্ধু-এক অভিন্ন হৃদয় হয়ে স্বরাজের জন্যে কাজ করতে পারে। ইউরোপে এ রকম কিছু বিয়ে হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্ধুত্ব-শুধু মাত্র বন্ধুত্ব। এই ধরনের মানুষই উচ্চতের যোগ্য। কারণ তারা জীবন থেকে কাম বাসনাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।"

বাবাজী অনেকক্ষন ধরে বিয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে লাগলেন। তার বিশ্বাস, বিয়ের সত্যিকারের আনন্দ তখনই উপভোগ করা সম্ভব যখন নারী এবং পুরুষের মধ্যে শুধুমাত্র দৈহিক সম্পর্কই থাকে না। পুরুষ আর নারীর দৈহিক সম্পর্ক তার কাছে তত বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, যা সাধারণত ভাবা হয়ে থাকে। হাজার হাজার মানুষ জিভের স্বাদ নেওয়ার জন্যেই খায়। তার মানে, এই স্বাদ গ্রহণ করাই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। খুব কম লোকই আছে যারা শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে খায়। আসলে তারাই খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কায়দা জানে। ঠিক সেই রকম এই ধরণের মানুষই বিয়ের পবিত্র ভাবনার বাস্তবিকতা এবং সম্পর্কের পবিত্রতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে দাম্পত্য-জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

বাবাজী তার নিজের এই বিশ্বাসকে আনেকটা এমনি ভাবে উপলব্ধি করেন। তাই তিনি মনকে স্পর্শ করে এমন কোমল ভাবনার সাহায্যে যখন তার বিশ্বাসকে ব্যাক্ষ্যা করলেন তখন শ্রোতাদের কাছে সম্পূর্ণ এক নতুন দুনিয়ার দরজা খুলে গেল। আমি নিজেই খুব প্রভাবিত হলাম। গুলাম আলী আমার সামনে বসেছিল। সে বাবাজীর ভাষনের প্রতিটি শব্দকে যেন

পান করছিল। বাবাজী যখন ভাষন বন্ধ করলেন তখন গুলাম আলী নিগারকে কি যেন বলল। তারপর সে উঠে কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বলল :

'আমার আর নিগারের বিয়ে এমন এক আদর্শ বিয়ে, যতদিন হিন্দুস্থানে স্বরাজ না আসবে, ততদিন নিগারের সম্পর্ক হবে বন্ধুর মতো।"

জালিয়ানওয়ালা বাগের রক্তিম পরিবেশ বহুক্ষণ ধরে বেপরওয়া তালির শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল। শাহজাদা গুলাম আলী ভাবুক হয়ে উঠল। তার কাশ্মীরী মুখের ওপর লালিমা খেলতে লাগল,অসংখ্য ভাবনার তুফানের মধ্যে সে নিগারকে উচ্চ কণ্ঠে বলল, "নিগার তুমি কি গুলাম সন্তানের মা বলে নিজেকে স্বীকার করে নিতে পারবে ?"

খানিকটা বিয়ের জন্যে খানিকটা বাবাজীর ভাষণ শুনে নিগার পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। গুলাম আলীর এই রূঢ় কথা শুনে আরো উন্মত্ত হয়ে উঠল। ও শুধু বলল, জী···জী···আজ্ঞে···আজ্ঞে না।

ভীড় আবার তালি বাজাল। আর গুলাম আলী আরও ভাবুক হয়ে উঠল। নিগারের গোলাম সন্তানকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে গুলাম আলী খুশীতে মশগুল হয়ে গেল। সে আসলে কথা থেকে দূরে সরে গিয়ে স্বাধীনতা হাসিল করার জন্য এক আঁকা-বাঁকা গলির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে সে উদাস আর ভাবুকতার সঙ্গে বলে বলল। হঠাৎ তার চোখ নিগারের ওপর পড়ল। না জানি তার কি হয়ে গেল—তার সমস্ত কথা ফুরিয়ে গেল। মানুষ যেমন মদের নেশায় কোন হিসেব না করে টাকা বের করে এবং ব্যাগ খালি করে দেয় তেমনি তার ভাষণের ব্যাগ খালি দেখে সে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের দু' জনকে আপনি আশীর্বাদ করুন। যে কথা আমরা দিয়েছি তা যেন রাখতে পারি।"

পরের দিন ভোর ছ'টায় শাহজাদা গুলাম আলী গ্রেফতার হয়ে গেল। কারণ স্বরাজ কায়েম না করা পর্যন্ত সন্তানের জন্ম বন্ধ করার যে অঙ্গীকার তার ভাষণে ছিল তাতে ইংরেজের গদি উলটিয়ে দেওয়ার ধমকও ছিল।

গ্রেফতারের কয়েক দিন পরে গুলাম আলীকে আট মাসের সাজা দেওয়া হল এবং তাকে জেলে পাঠানো হল। সে ছিল অমৃতসরের বিপ্লবী ডিকটেটর আর চল্লিশ হাজার বন্দীর মধ্যে একজন। কারণ যতদূর আমার

মনে আছে এই আন্দোলনে যারা বন্দী হয়েছিল তাদের সংখ্যা সম্পর্কে সমস্ত কাগজই চল্লিশ হাজার বলেছিল।

সবারই ধারণা ছিল স্বাধীনতার মঞ্জিল আর মাত্র হাত দুই দূরে। ফিরিঙ্গী রাজনীতিজ্ঞরা এই আন্দোলনকে দুধের মতো ফুটতে দিয়েছিল। কিন্তু যখন ভারতবর্ষের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা হল তখন সেই ফুটন্ত দুধ ঠাণ্ডা হয়ে লস্যিতে পরিণত হয়ে গেল।

আজাদী-পাগলার জেল থেকে বাইরে এসে জেলখানার কষ্ট এবং নিজেদের নষ্ট হয়ে যাওয়া ব্যবসা সামলাতে লেগে গেল। সাত মাস পরে শাহজাদা গুলাম আলী ছাড়া পেল। সে সময় তার মধ্যে আর আগের উৎসাহ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অমৃতসর স্টেশনে তাকে স্বাগত জানানো হল। আমি এগুলোতে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এই মহফিল গুলিতে কোন আনন্দ ছিল না। সবার ওপরে এক অদ্ভুত ধরণের ক্লান্তির ভাব ছেয়ে ছিল। যেন এক লম্বা দৌড়ের অংশগ্রহণকারীদের হঠাৎই বলা হল, দাঁড়াও দৌড় আবার প্রথম থেকে শুরু হবে। আর যারা দৌড়াচ্ছিল তারা কিছুক্ষণ ধরে হাঁফানের পর যেখানে থেকে আবার দৌড় শুরু হবে সেদিকে উৎসাহহীন ভাবে এগিয়ে চলল।

বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছিল। কিন্তু রসকসহীন এই ক্লান্তি ভারতবর্ষ থেকে এখনও যায়নি। আমার নিজের জগতেও এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ছোট-খাটো বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। দাড়ি-গোফ উঠেছে। কলেজে ভর্তি হয়েছি। এফ, এ, তে দু' দুবার ফেল করেছি। বাবা মারা গিয়েছেন। রুজি-রোজগারের জন্যে বহু জায়গায় ঘুরেছি। এক থার্ড ক্লাশ পত্রিকায় অনুবাদকের কাজ করেছি, এখানে মন না বসায় আবার পড়া-শোনার কথা ভেবেছি। আলিগড় ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হওয়ার তিন মাস পর টি. বি. তে আক্রান্ত হলাম। আক্রান্ত হয়ে কাশ্মীরের গ্রামগুলোতে ভবঘুরের মতো ঘুরতে লাগলাম। সেখান থেকে বোম্বাই এলাম। এখানে দু' বৎসরে তিন তিনবার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দেখলাম। মন ভেঙে যাওয়ায় দিল্লী চলে এলাম। বোম্বাইয়ের তুলনায় এখানে সমস্ত কিছুতেই কেমন একটা শ্লথ ভাব। কোথাও কোন গণ্ডগোল বা হাঙ্গামা হলে তাতে

কোন পৌরুষত্ব থাকত না—কেমন একটা মেয়েলিপনা। পরে মনে হল, এর থেকে বোম্বাই অনেক ভালো। সেখানে পাড়া-পড়শিদের নাম জিজ্ঞেস করার কোন ফুরসুৎ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাতে কি আসে যায়। যেখানে অঢেল অবসর থাকে সেখানেই ছল কপট চালবাজী বেশী হয়। দু' বৎসর দিল্লির উৎসাহ উদ্দীপনাহীন জীবন কাটানোর পর প্রাণ-চঞ্চল বোম্বাইতে আবার ফিরে এলাম।

বাড়ি থেকে বেরোনোর পর আট বৎসর হতে চলল। বন্ধু-বান্ধব এবং অমৃতসরের রাস্তা এবং গলিগুলোর অবস্থা কি তা আমি জানি না। কারো কাছ থেকে চিঠি-পত্রও পেতাম না যে জানতে পারব। ফলে এই আট বৎসরে আমি আমার অতীত দিনগুলো নিয়ে ভাবে? আট বৎসর আগে যে দিনগুলো খরচ হয়ে গিয়েছিল তার হিসেব-নিকেশ করে এখন কি লাভ? জীবনের টাকায় সেই পাই-পয়সারই বেশী দাম আছে যা তুমি আজকে খরচ করছ, আর আগামীকাল যার ওপর অন্যে নজর দেবে।

আজ থেকে ছ'বৎসর আগের কথা বলছি, যখন জীবনের টাকার ওপর আর রূপোর টাকার ওপর রাজার ছাপমারা ছিল তখন আমি এক পাই-পয়সাও খরচ করিনি। আমি এত গরীব ছিলাম না যে ফোটে গিয়ে কম দামের একজোড়া জুতাও কিনতে পারতাম না।

'আমি এ্যাণ্ড নেভি স্টোর'-এর এই দিকে হার্ণবি রোডের ওপর এক জুতার দোকান ছিল। তার শো কেশ আমাকে বহুক্ষণ ধরে আকৃষ্ট করে রেখেছিল। আমার স্মৃতি খুব কম জোড় বলে এই দোকান খুঁজে বের করতে বেশ সময় লেগে গিয়েছিল।

আমি তো নিজের জন্যে কম দামের এক জোড়া জুতা কিনতে এসেছিলাম। আর আমার যেমন অভ্যাস সেই অভ্যাস বসে অন্য কেস দেখলাম, আর একটায় দেখলাম পাইপ। এইভাবে দেখতে দেখতে একটা ছোট্ট দোকানের সামনে হাজির হলাম। ভাবলাম এখানে ঢুকেই কিনে নিই। দোকানদার খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাকে স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি চান সাহেব?

আমি একটু চিন্তা করে মনে করার চেষ্টা করলাম আমি কি চাই, 'হুঁ',

—ক্রেপ সোল সু।'

—'না, আমি রাখি না।'

বর্ষা এসে গিয়েছিল। ভাবলাম, গাম বুটই কিনে নিই—'গাম বুট বের করো।'

—'পাশের দোকানে পাওয়া যাবে। রবারের কোন জিনিস এখানে রাখা হয় না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

—'সেঠজীর মর্জি।'

এই স্পষ্ট এবং খোলাখুলি জবাব শুনে আমি দোকান থেকে যেই বেরুতে যাব তখনি একজন হাসি-খুশি মানুষের ওপর আমার নজর পড়ল। সে বাচ্চা কোলে নিয়ে ফুটপাতে ফলওয়ালার কাছ থেকে ফল কিনছিল। আমি বাইরে এলাম আর সে দোকানের দিকে মুখ ফেরাল। আমি চমকে উঠলাম, 'আরে···গুলাম আলী।'

'সাদত' বলে ও বাচ্চা নিয়েই আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। বাচ্চার এটা পছন্দ হল না, তাই সে কেঁদে উঠল। গুলাম আলীসেই লোকটাকে ডাকল, যে আমাকে বলেছিল, 'রবারের কোন জিনিস এখানে রাখা হয় না।' তাকে বাচ্চা দিয়ে বলল, 'যাও, এক ঘরে নিয়ে যাও। তারপর সে আবার আমার দিকে ফিরে বলল, 'কতদিন বাদে আমাদের দু' জনের দেখা হচ্ছে।'

আমি গুলাম আলীকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করলাম—আগের সেই মেজাজ, সেই অল্প-অল্প গম্ভীরভাব, যা তার নিজস্ব আভিজাত্য ছিল তার কোন চিহ্ন আমি খুঁজে পেলাম না। সেই অগ্নিবর্ষী বক্তা, সেই খদ্দরধারী নওজোয়ানের জায়গায় আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল এক সাধারণ গৃহস্থ। তার শেষ ভাষণের কথা আমার মনে পড়ে গেল। যে উদ্দীপ্ত ভাষণে জালিয়ানওয়ালা বাগের রক্তিম পরিবেশকে সে থরথর করে কাঁপিয়ে তুলেছিল, "নিগার তুমি কি এক গোলাম সন্তানের মা বলে নিজেকে স্বীকার করে নিতে পারবে?" সঙ্গে সঙ্গে গুলাম আলীর কোলে যে বাচ্চা ছিল তার কথা মনে পড়ল।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "গুলাম আলী, এই বাচ্চা কার?"

গুলাম আলী যেন সংকোচ না করেই বলল, "আমার। এর বড় আর একটি আছে। তোমার কয়টি আছে?"

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল, গুলাম আলী নয় অন্য কেউ কথা বলছে। অসংখ্য চিন্তা আমার মনে খেলে গেল। গুলাম আলী কি তার কসম ভুলে গিয়েছে? তার সেই বিপ্লবী জীবন থেকে কি সে এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন? হিন্দুস্থানের আজাদী দেওয়ার সেই জোস সেই উচ্ছ্বাস কোথায় গেল? সেই দাড়ি-গোফহীন আহবানের কি হল?···নিগার এখন কোথায়? ···সেও কি ছটি গোলাম সন্তানের মা হওয়া স্বীকার করে নিয়েছে? ···খুব সম্ভব ও বেঁচে নেই। হয়তো গোলাম আলী আর একটা বিয়ে করেছে।

"কি ভাবছ?···ছ-একটা কথা অন্ততঃ বল। এতদিন পরে দেখা হল।' গুলাম আলী আমার কাঁধে খুব জোরে একটি চাপড় মেরে বলল।

আমি কেমন বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়ে ছিলাম। ওর কথায় চমকে উঠলাম। 'এঁ্যা' বলে ভাবতে লাগলাম কি ভাবে কথা শুরু করি। কিন্তু গুলাম আলী আমার কথা বলার অপেক্ষা না করে বলতে লাগল, "এই দোকান আমার। দু'বৎসর ধরে আমি এখানে-এই বোম্বাইতে আছি। কারবার খুব ভালই চলছে। মাসে তিন-চার শ' হয়ে যায়। তুমি কি করছ? শুনেছি তুমি মস্ত গল্পকার হয়েছ। মনে আছে একবার আমরা পালিয়ে এখানে এসেছিলাম। দোস্ত, সেই বোম্বাই আর এই বোম্বাই-এর মধ্যে অনেক ফারাক বলে মনে হয়। যেন তা ছিল ছোট, আর এটা বড়।"

এমন সময়ে একজন খদ্দের এল। সে টেনিস সু চাইল। গুলাম আলী তাকে বলল, "রবারের জিনিস এখানে পাওয়া যায় না। পাশের দোকানে যান।"

খদ্দের চলে গেলে আমি গুলাম আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, "রবারের জিনিস তুমি কেন রাখ না? আমিও তো এখানে ক্রেপ সোল নিতে এসেছিলাম।"

আমি এমনিই এই প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু গুলাম আলীর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। খুব আস্তে সে বলল, "আমার পছন্দ নয় ভাই।"

"কেন পছন্দ নয়?"

"এই রবার—এই রবারের তৈরী জিনিস।" বলে সে হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু হাসতে না পেরে ও জোর করে শুষ্ক হেসে বলল, "আমি তোমাকে বলব। এ একেবারে ফালতু জিনিস, কিন্তু·····কিন্তু আমার জীবনে এ কতখানি গভীরতা নিয়ে জড়িয়ে আছে, তোমাকে কি বলব।"

গভীর একটা চিন্তার রেখা গুলাম আলীর মুখে ফুটে উঠল। ওর চোখ, যে চোখে এখনও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের রেশ আছে তা ক্ষনিকের জন্যে নৈরাশ্যে ভরে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার তাতে আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠল, "দোস্ত, এ জীবন হচ্ছে কথার ফুলঝুরি।·····সত্যি বলছি সাদত, আগের দিনগুলি, যে দিনগুলিতে আমার চিন্তার ওপর লিডারি চেপে বসেছিল তা ভুলে গিয়েছি। চার-পাঁচ বৎসর ধরে আমি ভালই আছি। স্ত্রী আছে বাল বাচ্চা আছে, আল্লার রহম আছে।

গুলাম আলী বলতে লাগল, আল্লার রহমে কত পুঁজি নিয়ে কি ভাবে সে বিজনেশ শুরু করল, এক বৎসরে কত টাকা লাভ হল এবং এখন ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে। আমি তার কথার মাঝখানেই খোটা দিয়ে বললাম, "কিন্তু তুমি কোন ফালতু জিনিস নিয়ে শুরু করেছিলে, যা তোমার জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।"

গুলাম আলীর মুখ আর একবার ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে এক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, "হাঁ, এক সময় গভীর ভাবে যুক্ত ছিল—কিন্তু এখন তা নেই·····বলতে গেলে তোমাকে এক দীর্ঘ গল্প বলতে হয়।"

এর মধ্যেই তার চাকর এসে গেল। দোকানের ভার তাকে দিয়ে গুলাম আলী আমাকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে বসিয়ে সে আমাকে বলতে লাগল, রবারের জিনিস সম্পর্কে তার এত বিরূপ মনোভাব কেন।

"আমার বিপ্লবী জীবন কিভাবে শুরু তা তো তুমি ভালো ভাবেই জান। আমার ক্যারেকটর কেমন ছিল তাও তোমার জানা আছে। আমরা দু'জনে প্রায় একই রকম ছিলাম। এ কথা বলার আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদেরও মা-বাবাও জোর দিয়ে বলতে পারতেন না যে আমার ছেলে ভালো। জানি না, আমি তোমাকে এসব কথা কেন বলছি। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই

বুঝতে পারছ আমি দৃঢ় চরিত্রের লোক ছিলাম না। আমার ইচ্ছা ছিল আমি কিছু করি। সেজন্যেই বিপ্লবের সঙ্গে আমার এত অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি মিথ্যাবাদী ছিলাম না। উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে আমি জীবনও দিয়ে দিতে পারতাম। এখনও তাই আছি। কিন্তু আমি বুঝেছি—অনেক চিন্তা ভাবনার পর এই সত্যে পৌঁছেছি যে, হিন্দুস্থানের বিপ্লব, তার লিডাররা সব শিশু। আমি যে রকম ছিলাম ঠিক তেমনি আমার মত তারাও শিশু। একটা ঢেউ উঠলে তাতে উৎসাহ-উদ্দীপনা শক্তি হৈ চৈ সবই থাকত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা আবার নিস্তেজ হয়ে, পড়ত। আমার ধারনা ঢেউ সৃষ্টি করা হত না। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ঠিক ভাবে বোঝাতে পারলাম না।"

গুলাম আলীর চিন্তাধারার মধ্যে এক প্রচণ্ড জ্বালা ছিল। আমি তাকে সিগারেট দিলাম। সিগারেট জ্বালিয়ে সে কসে কসে তিনবার টান দিয়ে বলল, "তোমার কি মনে হয় না আজাদী লাভের জন্যে হিন্দুস্থানের প্রতিটি প্রচেষ্টা নেহাতই দুর্ভাগ্য। প্রচেষ্টা না বলে বলা যায় প্রতিবারই তার পরিণতি হচ্ছে দুর্ভাগ্য। কেন আমরা আজাদী পাচ্ছি না? আমরা কি সবাই নপংশুক? না। আমরা সবাই মরদ। কিন্তু আমরা এমন এক পরিবেশে আছি সে আমাদের কাজের হাত আজাদী পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।"

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কি মনে হয়, আজাদী আর আমাদের মধ্যে এমন কি আছে যা ব্যারিকেড হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

গুলাম আলীর চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই, কিন্তু তা কোন কংকিটের দেওয়াল নয়, কোন কঠিন প্রান্তরও নয়—এ হচ্ছে আমাদের বিশ্বাসের এক পাতলা জাল। এ হচ্ছে আমাদের নকল জীবনের—যেখানে মানুষ অন্যকে প্রতারণা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও প্রতারিত করে।"

ওর মেজাজ তিরীক্ষি হয়ে উঠল। মনে হল ও ওর জীবনের অতীত ঘটনাগুলোকে নিজের মধ্যে ঝালিয়ে নিচ্ছে। সিগারেট নিভিয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে গলা ছেড়ে বলল, 'মানুষ যেমন আছে তাকে তেমন ভাবেই থাকা উচিত। ভালো কাজ করার জন্যে নিজের মাথা নেড়া করা, গেরুয়া

কাপড় পরা বা গায়ে ভস্ম মাখার কি দরকার। তুমি হয়তো বলবে, এ তার ইচ্ছা। কিন্তু আমার মনে হয় তার এই ইচ্ছা—তার এই অদ্ভুত জিনিস থেকেই সে বিপথগামী হয়। উঁচুদরের মানুষ হয়েও তার এই ইচ্ছা মানুষের সাধারন দুর্বলতা ছড়িয়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু সে ভুলে যায় তার ক্যারেকটর তার চিন্তা-ভাবনা তার বিশ্বাস একদিন হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু তার নেড়া মাথা, তার গায়ের ভস্ম, তার গেরুয়া কাপড় সহজ সরল মানুষের মনে চিরদিন জাগরুক হয়ে থাকবে।"

বলতে বলতে গুলাম আলী আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'দুনিয়াতে এত সংস্কারক জন্মেছে যে মানুষ তাদের উপদেশ ভুলে গিয়েছে। রয়ে গিয়েছে শুধু তাদের.....সুতো দাড়ি বালা আর বগলের চুল। এক হাজার বৎসর আগে যে এখানে থাকত তার থেকে আমরা অনেক বেশী অভিজ্ঞ কিন্তু আমি বুঝতে পারি না আজকের সংস্কারকরা কেন এ কথা চিন্তা করেছেন না যে তাঁরা শুধু মায়ের মুখের আদলটুকুই পালটাচ্ছেন। একেক বার মনে হয় চীৎকার করে বলি, খোদার নামে মানুষকে মানুষ হিসেবে থাকতে দাও। তার যে মুখের আদল পাল্টিয়েছ তা থাক, এখন তার ওপর একটু রহম কর। তুমি তাকে খোদা বানানোর চেষ্টা করছ, বেচারা তার মনুষত্ব হারাচ্ছে,.....সাদত, আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, এ আমার অন্তরের কথা। আমি যা উপলব্ধি করেছি তাই বলছি। আমার এই উপলব্ধি যদি মিথ্যা হয় তবে কোন কিছুই সাচ্চা নয়। আমি দু'বৎসর মনের সঙ্গে জোড় কুস্তি লড়েছি। আমি আমার মন, আমার উপলব্ধি, আমার বিশ্বাস আমায় প্রতিটি তন্ত্রীর সঙ্গে পাঞ্জা কষে বুঝতে পেরেছি মানুষকে মানুষই হতে হবে। হাজারের মধ্যে একজন দু'জন মানুষ যৌন-ভাবনা থেকে মুক্ত। সবাই যদি যৌন ভাবনা থেকে মুক্ত হয় তবে ভস্ম কার কাজে লাগবে?"

এই পর্যন্ত বলে সে একটা সিগারেট নিল এবং সিগারেট ধালিয়ে ঘাড়কে একটু আলতো ভাবে ঝটকা দিয়ে বলল, 'না সাদত, তুমি জান না আমি দেহে আর মনে কী জ্বালাই না সহ্য করেছি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে কেউ যাক না কেন তাকে কষ্ট সহ্য করতেই হবে।...সেই দিন, সেই দিনের কথা

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে—জালিয়ানওয়ালা বাগে আমি আর নিগার অঙ্গীকার করেছিলাম, গোলাম সন্তানের জন্ম দেব না। অঙ্গীকার করে এক অদ্ভুত ধরণের—বিদ্যুতের মতো এক আনন্দ অনুভব করেছিলাম। মনে হয়েছিল এই অঙ্গীকার করে আমার মাথা উঁচু হয়ে আকাশকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু জেল থেকে ফিরে এসে আমি এই কথার জন্যে দেহের যে জ্বালা তা ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলাম। আমার দেহের জ্বালার অনুভব হতে লাগল, আমার দেহে আমার রক্ত সব কিছু ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। নিজের হাতে নিজের জীবনের বাগিচার সবচেয়ে সুন্দর ফুলকেই ছিঁড়ে কুটি কুটি করেছি।.....প্রথম প্রথম এই ভাবনা আমার মধ্যে এক অদ্ভুত ধরণের সান্ত্বনা সৃষ্টি করেছিল যে আমি অন্যের থেকে পৃথক, কারণ আমি এমন কাজ করেছি যা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার চেতনার তন্ত্রী জাগরিত হতে লাগল এবং বস্তুত আমার দেহের প্রতিটি লোম তীব্র জ্বালায় ভরে উঠল।.....জেল থেকে ফিরে এসে আমি নিগারের সঙ্গে দেখা করলাম। হাসপাতাল থেকে তখন ও বাবাজীর আশ্রমে চলে গিয়েছিল.....সাত মাস জেল খাটার পর আমি যখন ওর সঙ্গে দেখা করলাম, দেখলাম ওর রঙ, ওর শরীর কেমন পালটিয়ে গিয়েছে। মনে হল আমি ভুল দেখছি।

"কিন্তু এক বৎসর—এক বৎসর ওর সঙ্গে কাটানোর পর।" বলতে বলতে গুলাম আলীর ঠোঁটের ওপর এক করুন হাসি খেলে গেল—হাঁ এক বৎসর ওর সঙ্গে থাকার পর আমি বুঝতে পারলাম আমার মতো ওরও অবস্থা...না ও আমর কাছে তা প্রকাশ করতে চাইল না, আমিও ওর কাছে প্রকাশ করতে চাইলাম না ...আমরা দু'জনে নিজের নিজের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়ে রইলাম...এক বৎসরের মধ্যে বিপ্লবী জোস ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। খদ্দরের পোশাক এবং তেরঙ্গা ঝাণ্ডার প্রতি আগের সেই দরদ আর রইল না। কখনও কখনও যদি বা ইনক্লাব জিন্দাবাদ শ্লোগান উঠত কিন্তু তাতে আগের সেই তেজ সেই ঝাঁঝ ছিল না।...জালিয়ানওয়ালা বাগে একটি তাম্বুও আর ছিল না। "পুরানো ক্যাম্পের খুটি কোথাও কোথাও চোখে পড়ত.....রক্তে টগবগ বিপ্লবী উত্তেজনা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল...

আমি তখন প্রায় সময়েই ঘরে স্ত্রীর কাছে বসে থাকতাম।"

গুলাম আলীর ঠোঁটের ওপর আর একবার করুণ হাসি খেলে গেল। আমিও কোন কথা বললাম না, কারণ আমি তার ভাবনার জাল ছিঁড়তে চাইলাম না।

অনেকক্ষন বাদে সে তার কপালের ঘাম মুছল এবং সিগারেট নিভিয়ে বলতে শুরু করল, 'আমরা দু'জনে এক অদ্ভুত ধরণের ধিকারে বন্দী ছিলাম। নিগারকে আমি কত গভীর ভাবে ভালোবাসতাম তা তো তুমি জান।...আমি ভাবতে লাগলাম, এই ভালোবাসা কি জিনিস? আমি ওকে স্পর্শ করলে ওর শরীর থরথর করে কেঁপে উঠত। আমি সেই কম্পনকে শেষ পর্যন্ত এগুতে দিতে চাইতাম না।.....কোন পাপ হবে বলে কি আমি ভয় করতাম? নিগারের চোখ আমার খুব ভালো লাগত। একদিনের কথা বলছি, খুব সম্ভব সেদিন আমার অবস্থা ভালই ছিল, প্রতিটি মানুষের যে ইচ্ছা হয় আমার মধ্যেও সে ইচ্ছা জেগে উঠল, আমি নিগারকে চুমো খেলাম। ও আমার বাহুতে আবদ্ধ ছিল—আমার বাহুর মধ্যেই ও থরথর করে কেঁপে উঠল। আমার রক্ত যেন পাখির মতো ডানা মেলে আকাশের দিকে উড়ে যেতে চাইল, আর আমি ওকে জোরে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর অনেক—অনেকক্ষণ পর কয়েক দিন পর্যন্ত আমি আমার এই কাজের জন্যে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমার এই বাহাদুরী কাজে আমার রক্তে এমন এক তৃপ্তি এসেছিল যা খুব কম মানুষেরই হয়। কিন্তু যা সত্য তা হচ্ছে আমি অপারক ছিলাম আর এই অপারকতা-কেই আমি মহান কাজ বলে মনে করতে চাইছিলাম। খোদার কসম, আমার হৃদয়ের পবিত্রতা ছিল বলে আমি ভাবতাম আমার মতো সুখী মানুষ পৃথিবীতে আর দুটি নেই। কিন্তু মানুষও তো কোন না কোন ভাবে পথ খুঁজবে—আমিও একটা পথ খুঁজে নিলাম। আমরা দুজনেই এতে সুখী ছিলাম—কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমাদের সমস্ত তৃপ্তি এবং কোমলতার ওপর পরত জমতে লাগল। আমাদের জীবনে এ ছিল এক বিরাট ট্রাজেডি। আমরা পরস্পরের কাছে পর হয়ে রইলাম। আমি ভাবতে লাগলাম—অনেক, অনেক দিন ধরে ভাবার পর আমি আমার

প্রতিজ্ঞাকে ঠিক মনে করলাম—নিগার গোলাম সন্তানের জন্ম দেবে না।

এই কথা বলতে বলতে তার ঠোঁটের ওপর তৃতীয়বার সেই করুণ হাসি খেলে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে উচ্চ হাসির রোল খুলল, যে হাসিতে মিশে ছিল দৈহিক জ্বালার এক অদ্ভুত আকাঙ্খা। নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে গুলাম আলী বলতে লাগল, "আমাদের বিবাহিত জীবনের এক অদ্ভুত দৌড় শুরু হল। যেন অন্ধ একটি চোখ ফিরে পেয়েছে। আমি সামান্য আলোকেই এক পা তুললাম। কিন্তু এই আলোও অল্পক্ষনের মধ্যে ম্লান হতে লাগল। প্রথম প্রথম মনে হত..."গুলাম আলী ঠিক প্রতিশব্দের জন্যে হানড়াতে লাগল..."প্রথম প্রথম আমরা ঠিক-ঠাকই ছিলাম। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি প্রথম প্রথম আমার একেবারেই মনে হয়নি যে অল্প দিনের মধ্যে আমি পাগল হয়ে উঠব এক চোখ ভিক্ষা চাইতে লাগল আরেকটি চোখও যেন ঠিক হয়ে যায়। প্রথম প্রথম আমরা যে ভাবে দৈহিক শুদ্ধতা বজায় রাখলাম তাতে আমাদের চেহারা খুলে গেল—নিগারের চোখে মুখে চমক খুলে উঠল। আমার দেহ থেকেও সেই কাট-খোট্টা ভাব দূর হয়ে গেল; যে শুষ্কতা আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের দু'জনের ওপর আবার এক অদ্ভুত মৃত মৃত ভাব ছেয়ে যেতে লাগল। এক বৎসরের মধ্যে আমরা দু'জনে রবারের পুতুলের মতো হয়ে গেলাম। আমার আকাঙ্খা নিগারের চেয়ে বেশী তীব্র ছিল। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না সেই সময় আমি হাতের মাংসে যদি চিমটি কাটতাম তা আমার কাছে একেবারে রবারের মতো হত। মনে হত শরীরের ভেতর কোন রক্তের তন্ত্রী নেই। যতটুকু আমি জানি নিগারের অবস্থা আমার থেকে একটু পৃথক ছিল। ওর চিন্তা ভাবনা অন্য রকম ছিল। ও মা হতে চাইছিল। পাড়াতে কারো কোন ছেলে-পেলে হলে ও ওর দীর্ঘশ্বাস নিজের বুকের মধ্যেই চেপে রাখত। কিন্তু আমার বাচ্চা সম্পর্কে কোন আগ্রহ ছিল না। বাচ্চা না হয়েছে তো কি হয়েছে? পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যাদের কোন বাচ্চাকাচ্চা নেই। একি কম কথা যে আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করছি? এতে

আমি হয়তো খানিকটা আরাম বোধ করেছিলাম সত্য, কিন্তু আমার মনের ওপর যখন রবারের তির তির জ্বালা শুরু হল তখন আমি খুব ঘাবড়িয়ে গেলাম।...আমি সব সময় রবারের কথাই ভাবতে লাগলাম। ফলে আমার মনের সঙ্গে রবার চিপটে গেল। রুটি খেতে গেলে রুটি আমার দাঁতের নীচে কচকচ করত। বলতে বলতে গুলাম আলীর সারা শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেল, "জানি, খুবই বাজে এবং ভুল ব্যাপার ছিল, অঙ্গুল সব সময় মনে হত সাবানের মতো কিছু একটা লেগে আছে...নিজের ওপরই বিতৃষ্ণা এসে গেল। মনে হচ্ছিল আমার শরীরের সমস্ত রসকস শুকিয়ে গিয়েছে আর রয়ে গিয়েছে শুধু খোলসটুকু। রবারের জিনিস ব্যবহার করলে যেমন হয় ঠিক সেই রকম।"

...গুলাম আলী হাসতে লাগল,... "ভাগ্যি এই ঘিন ঘিনে ভাবটা দূর হয়ে গিয়েছিল, সাদত, কিন্তু তা গিয়েছিল অনেক কষ্টের পরে। জীবন শুকিয়ে একেবারে কুচকে গিয়েছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় মরে গিয়েছিল...কাঠ আয়না লোহা কাগজ পাথর সমস্ত জায়গায় রবারের সেই প্রাণহীনতা দেখতাম। আর তা এত নরম ছিল যে বমি এসে যেত। এই কষ্ট ছিল আরও গভীর আরও মর্মান্তিক। আমি এর কারণ যখন ভাবতাম...দু'আঙ্গুল দিয়ে তা উঠিয়ে হয়তো ছুঁড়ে ফেলতে পারতাম, কিন্তু আমার মধ্যে সেই হিম্মত ছিল না। চাইতাম, কেউ আমাকে এ ব্যপারে সাহায্য করুক। কষ্টের এই অতল সমুদ্রে যদি এক টুকরো খড়ও পাই তবে কিনারায় পৌঁছতে পারি...অনেক দিন পর্যন্ত আমি হাত-পা ছুঁড়তে লাগলাম।... একদিন আমি ছাদের রোদে বসে যখন একটা ধর্মের বই পড়ছিলাম, পড়ছিলাম বললে ভুল হবে এমনি চোখ বুলোচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার চোখ এক হাদিসের ওপর পড়ল। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। আমার চোখের সামনেই অবলম্বন ছিল। আমি বারবার সেই পংক্তিগুলো পড়লাম, আমার শুষ্ক জীবনে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে গেল...লেখা ছিল, বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর সন্তান জন্ম দেওয়া কর্তব্য...মা-বাবার জীবন যদি বিপদসঙ্কুল হয় একমাত্র তখনই বংশ বৃদ্ধি রোধ করা উচিত, তা ছাড়া নয়। আমি দু'আঙ্গুলে সেই কষ্টকে তুলে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

এ কথা বলে সে শিশুর মতো হাসতে লাগল। আমিও হেসে দিলাম। কারণ দু'আঙুল দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা সে এমন ভাবে ছুঁড়ে দিল যেন তা ঘৃণার জিনিস।

হাসতে হাসতে গুলাম আলী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, 'সাদত আমি জানি, আমি এতক্ষণ তোমাকে যা বললাম, তুমি তা নিয়ে গল্প ফেঁদে বসবে। কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা কর না। খোদার কসম খেয়ে বলছি, যা অনুভব করেছি তাই তোমাকে বলেছি। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করব না। যা কিছু আমি পেয়েছি তা দুর্ভাগ্যের বিরোধিতা করেই পেয়েছি—কিন্তু সে বিরোধিতার কোন বাহাদুরি নেই। এর কি অর্থ আছে যে তুমি ভুখা থাকতে থাকতে মরে যাও বা বেঁচে থাক...কবর খুঁড়ে সেখানে নিজেকে গোড় দাও আর কয়েকদিন পরে তার মধ্যে দম বন্ধ করে থাক, তীক্ষ্ণ শর শয্যায় মাসের পর মাস শুয়ে থাক, বছরের পর বছর এক হাত ওপরে উঠিয়ে রাখ বা শুকিয়ে শুকিয়ে একেবারে কাঠি হয়ে যাও—এই রকম মাদারি খেলা খেলে না খোদাকে পাওয়া যায়, না স্বরাজ পাওয়া যায়। আমার বিশ্ব হিন্দুস্থান যে স্বরাজ পাচ্ছে না তার কারণ এখানে মাদারি খেলওয়ারের সংখ্যাই বেশী—লিডার কম। যা চলছে তা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়...সত্য আর সাচ্চা হৃদয়ের ব্যর্থ কণ্টোল করার জন্যে তারা বিপ্লবকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এ এমন এক বিপ্লব, যা স্বাধীনতার গর্ভ-নাড়ির মুখকেই বন্ধ করে দিয়েছে...।"

গুলাম আলী আরও কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু তার চাকর ভেতরে এল। তার কোলে গুলাম আলীর আর একটি বাচ্চা ছিল। বাচ্চাটির হাতে একটি সুন্দর রঙীন বেলুন ছিল। গুলাম আলী পাগলের মতো সেই বেলুনটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।—পটাশ করে বেলুনটি ফেটে গেল। বাচ্চার হাতে সুতোর সঙ্গে ছোট্ট একটা রবার ঝুলতে লাগল। গুলাম আলী দু'আঙুল দিয়ে সেই রবারের টুকরোটা নিয়ে এমন ভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিল যেন তা একটা ঘৃণার জিনিস।

———

। টোবা টেকসিং ।।

দেশ বিভাগের দু-তিন বৎসর পর পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থান সরকারের খেলায় হল কয়েদীদের মতো পাগলদের আদান প্রদান হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ যে মুসলমান পাগল হিন্দুস্থানের পাগলা গারদে আছে তাদের পাকিস্তানে এবং যে সব হিন্দু ও শিক পাকিস্তানের পাগলা গারদে আছে তাদের হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

জানি না এ ঠিক ছিল কি বেঠিক ছিল। যাই-ই হোক, বুঝদার মানুষের রায় অনুসারে উচ্চস্তরের কনফারেন্স হল এবং শেষে এক দিন পাগলদের আদান প্রদানের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান চালানো হলো। যে সব মুসলমান পাগলদের আত্মীয় স্বজন হিন্দুস্থানে আছে তাদের সেখানেই রাখা ঠিক হল। আর পাকিস্তান থেকে যেহেতু সব হিন্দু এবং শিক হিন্দুস্থানে চলে গিয়েছে তাই কাউকেই আর এখানে রাখার কথাই ওঠে না। যত হিন্দু এবং শিখ পাগল ছিল তাদের পুলিশের পাহারায় সীমান্তে পৌছে দেওয়া হল। ওদিককার কোন খবর নেই। কিন্তু এ দিকে লাহোরের পাগলা গারদে এই আদান-প্রদানের খবর পৌঁছলে খুব মজার মজার ঘটনা ঘটল। এক মুসলমান পাগল, যে বারো বৎসর ধরে প্রতিদিন নিয়মিত 'জমিদার' পত্রিকা পড়ে আসছে, তাকে তার একবন্ধু জিজ্ঞেস করল, 'মৌলভী সাহাব, এই পাকিস্তান বস্তুটা কি? মৌলভী সাহেব খুব গম্ভীর ভাবে কিছু চিন্তা করে বলল, "হিন্দুস্থানের মধ্যে এ এমন এক জায়গা যেখানে খুর তৈরী হয়।"

মৌলভী সাহেবের উত্তর শুনে তার বন্ধু আর কোন কথাই বলল না।

একজন শিখ পাগল আর একজন শিখ পাগলকে জিজ্ঞেস করল, "সর্দারজী, আমাদের হিন্দুস্থানে কেন পাঠানো হচ্ছে? আমার তো ওখানকার ভাষা জানা নেই"

অন্য শিখ পাগলটি হেসে বলল, "আমার কিন্তু হিন্দুস্থানের ভাষা জানা আছে তবে হিন্দুস্থানীরা খুব ভাটের মাথায় চলা-ফেরা করে।"

একদিন এক মুসলমান পাগল স্নান করতে করতে এমন জোড়ে 'পাকি-স্থান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিল যে, পা পিছলে সে সানের উপর পড়ে বেহুশ হয়ে গেল। এমন কিছু পাগল ছিল যাদের ঠিক পাগল বলা যায় না। এদের অধিকাংশই ছিল খুনী। এ সব খুনীদের সঙ্গে জড়িত অফিসাররা ফাঁসীর দড়ি থেকে তাদের বাচানোর জন্যে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে এখানে পাঠিয়েছে।

এরা অবশ্য কিছু কিছু বোঝে, দেশ বিভাগ কেন হয়েছে এবং পাকিস্তান কি। কিন্তু সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তারাও বিশেষ কিছু জানেনা। খবরের কাগজ থেকে সমস্ত ঘটনা আঁচ করা সম্ভব নয়। আর পাহাড়াদার সিপাইরাও অজ্ঞ এবং তাদের ব্যবহার ভিষন রুক্ষ। ওদের আলাপ আলোচনা থেকে কোন কিছুই বেরিয়ে আসে না। তারা কেবল এতটুকুই জানে মহম্মদ আলী জিন্না নামে একজন মানুষ আছেন, যাঁকে কায়েদ-ই-আজম বলা হয়। ইনি মুসলমানদের জন্যে এক পৃথক দেশ বানিয়েছেন—যার নাম পাকিস্তান। কিন্তু এই পাকিস্তান কোথায় আছে? এর উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। কারণ পাগলা গারদের এরা সবাই উন্মাদ। যাদের মাথা একে বারে বিগড়ে যায়নি, তাদের চিন্তা তারা পাকিস্তানে আছে, না হিন্দুস্থানে আছে। যদি হিন্দুস্থানে থাকে তবে পাকিস্থান কোথায়, আর যদি পাকিস্তানে থাকে তবে এই জায়গা কিছুদিন আগেও হিন্দুস্থান ছিল। একজন পাগলা হিন্দুস্থান-পাকিস্তান পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের এমন চরকি পাকের মধ্যে পড়ল যে তার মাথা আরো বিগড়ে গেল। ঝাঁট দিতে সে একদিন এক গাছের ডালে বসে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানের মৌলিক সমস্যার ওপর লাগাতার দু'ঘণ্টা ভাষণ দিল। সিপাইরা তাকে নীচে নামতে বললে সে আরো ওপরের ডালে চড়ে বসল। তাকে ধমকানো এবং ভয় দেখানো হলে সে বলল, 'আমি হিন্দুস্থানে ও থাকতে চাই না, পাকিস্তানেও না। আমি এই গাছের ওপরেই থাকব।"

বুজিয়ে সুজিয়ে তার রাগ ঠাণ্ডা করা হলে সে গাছ থেকে নেমে এসে হিন্দু এবং শিখ বন্ধুদের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। তাকে ছেড়ে এরা সব হিন্দুস্থানে চলে যাবে এই চিন্তায় তার মন দুঃখে ভরে উঠল।

এখানে একজন মুসলমান এম. এস-সি. পাশ রেডিও ইঞ্জিনিয়ার পাগল ছিল। অন্যান্য পাগলদের থেকে তার একটু বিশেষত্ব ছিল। বাগানের এক বিশেষ এক অংশ সে দিন-ভর ঘুরে বেড়াত, হঠাৎ-ই তার মধ্যে এক পরিবর্তন দেখা দিল। সে তার সমস্ত জামা-পাপড় খুলে পাহাড়াদারকে দিল। এবং উলঙ্গ হয়ে সারা বাগান ঘুরে বেড়াতে লাগল।

চনয়ুটের এক মুসলমান পাগল, যে উন্মাদ হওয়ার আগে মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী ছিল, হঠাৎ-ই সে স্নান-করা বন্ধ করে দিল। তার নাম ছিল মুহাম্মদ আলী। একদিন সে তার জানলা দিয়ে ঘোষণা করল সে মুহাম্মদ আলী জিন্না। তাকে দেখে একজন শিখ পাগল মাস্টার তারা সিং হয়ে গেল। সামনা-সামনি হলে খুনোখুনীর ভয় ছিল বলে দুধর্ষ পাগলদের পৃথক পৃথক সেলে বন্ধ রাখা হল।

লাহোরের এক তরুণ হিন্দু উকিল, যে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে পাগল হয়েছিল। সে যখন শুনল অমৃতরস হিন্দুস্থানে পড়েছে তখন তার খুব কষ্ট হল। কারণ এই শহরের এক হিন্দু তরুণীর সঙ্গে তার এক সময় প্রেম ছিল। যদিও সেই তরুণী উকিলকে আঘাত দিয়েছিল তবুও সে পাগলাগারদের এই পরিবেশে থেকেও তাকে ভুলতে পারেনি। তাই সে হিন্দু এবং মুসলমান সেই সব নেতাদের গালাগালি করত যারা একজোট হয়ে হিন্দুস্থানকে দু'টুকরো করেছে। তার প্রেমিকা হিন্দুস্থানী হয়েছে আর সে পাকিস্তানী।

আদান-প্রদানের কথা যখন শুরু হল, তখন অন্যান্য পাগলরা তাকে বুঝালো এ জন্যে তার দুঃখ করে লাভ নেই। যে হিন্দুস্থানে তার প্রেমিকা আছে সেখানে তাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু লাহোর ছাড়তে সে একেবারেই রাজী নয়। কারণ তার বিশ্বাস, অমৃতসরে তার প্রাকটিস চলবে না। ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে দু'জন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাগল ছিল। তারা যখন বুঝতে পারল হিন্দুস্থানকে স্বাধীনতা দিয়ে ইংরেজরা চলে গিয়েছে, তখন তাদের খুব দুঃখ হল। তারা দু'জন লুকিয়ে লুকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভীষণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা

করতে লাগল, পাগলা গারদে তাদের পোজিশন কি রকম হবে? ইউরোপিয়ান ওয়ার্ড থাকবে না তুলে দেওয়া হবে? ব্রেকফাস্ট পাওয়া যাবে, না পাওয়া যাবে না? ডবল রুটির বদলে কি তাদের তন্দুরী খেতে হবে?

একজন শিখ ছিল— যাকে পাগলা গারদে দেওয়ার পর দীর্ঘ পনর বৎসর পার হয়ে গিয়েছে। সব সময়েই তার মুখ দিয়ে এক বিচিত্র ভাষা বের হত-ও পড় দি গিড়-গিড় দি এক্স দি বে ধ্যানা দি মংগ দি, দাল আও দি লালটেন।" দিনে বা রাত্রে কোন সময়েই সে এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমোয়নি। —শোয়ওনি। হ্যাঁ, কখনো কখনো বা কোন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াত। সব সময় দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে তার পা দুটি সোজা হয়ে গিয়েছিল। দু' উরু ফুলে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই ভীষন কষ্ট সত্ত্বেও সে আরাম করত না। হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের পাগলদের আদান-প্রদান নিয়ে পাগলা গারদে যখন কোন আলাপ-আলোচনা হত তখন সে খুব মনোযোগ দিয়ে তা স্থনতো। কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করত, তোমার কি মনে হয়, তখন সে উত্তর দিত, "ও পড় দি গিড়-গিড় দি এক্স দি বে ধ্যানা দি মংগ দি দাল আও দি, পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট।"

পরে সে আও দি পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের জায়গায় যোগ করল আও দি টোবা টেকসিং এবং সব পাগলদের জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করল, যেখানে সে থাকত সেই টোবা টেকসিং কোথায়? কিন্তু তার কেউই জানত না টোবা টেকসিং পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে। যারা তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করত, তারা নিজেরাই চড়কি পাকে পড়ে যেত। শিয়ালকোট প্রথমে হিন্দুস্থানে ছিল, এখন শুনছে পাকিস্তানে। কে জানে, যে লাহোর এখন পাকিস্তানে আগামীকালই হয়তো তা হিন্দুস্থানে চলে যাবে—কিম্বা সারা হিন্দুস্থানই পাকিস্তান হয়ে যাবে। এমন কোন্ মানুষ আছে যে তার বুকে হাত রেখে বলতে পারে হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান হঠাৎ একদিন লোপাট হয়ে যাবে না। আর দুনিয়ায় যার কোন নাম নিশানাই থাকবে না।

ঝড়ে পড়তে পড়তে এই শিখ পাগলের মাথায় খুব অল্প চুলই আর অবশিষ্ট ছিল। স্নান করা সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। তার দাড়ি আর মাথার চুল জট পাকিয়ে গিয়েছিল। ফলে তার চেহারা ভয়ানক দেখাচ্ছিল। কিন্তু এই মানুষটি ছিল একেবারে সোজা। পনের বৎসরে সে একদিনও কারু সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করেনি। পাগলা গারদের পুরানো চাকর তার সম্পর্কে শুধু এইটুকুই জানে, টোবা টেকসিং-এ একদিন তার জমিদারী ছিল। সে ছিল পয়সাওয়ালা জমিদার। কিন্তু হঠাৎ-ই তার মাথায় গণ্ডগোল হয়। তাই তাহার আত্মীয়রা মোটা মোটা লোহার শিকলে বেঁধে তাকে এখানে নিয়ে আসে। মাসে একবার তারা খোঁজ-খবর নিতে আসত। কিন্তু যেদিন থেকে হিন্দু-স্থান-পাকিস্তানের গোণ্ডগোল শুরু হল, সেদিন থেকে তারা আর আসে না।

তার নাম ছিল শবন সিং। কিন্তু সবাই তাকে টোবা টেকসিং বলত। সে আদৌ-জানত না আজ কোন দিন, কোন মাস, কোন বৎসর। কিন্তু প্রতি মাসে যে সময় তার আত্মীয়-স্বজনরা তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসত তখন সে আপনার থেকেই বুঝতে পারত। সে পাহারাদারদের বলত তার সাক্ষাৎ-এর দিন আসছে। ঐ দিন খুব ভালোভাবে স্নান করত, গায়ে বেশ করে সাবান মাখতো আর মাথায় তেল দিয়ে চিরুনী করত। নিজের জামা কাপড় সে কোন দিনই বের করত না, কিন্তু সেদিন সে তা বের করে পড়ত। আর সেজে-গুজে তাদের সঙ্গে দেখা করতে যেত। তারা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে, সে কোন উত্তরই দিত না। কখনো কখনো শুধু বলত, "ও পড় দি গিড়-গিড় দি লালটেন!"

তার একটি মেয়ে ছিল—প্রতিমাসে এক আঙুল করে বেড়ে উঠতে উঠতে আজ সে পনর বৎসরের যুবতীতে পরিণত হয়েছে। শবন সিং তাকে চিনতেই পারেনি। যখন সে বাচ্চা ছিল তখন সে তার বাবাকে দেখে খুব কাঁদতো। আজ যুবতী হওয়ার পর তার চোখ দিয়ে শুধু অঝোরে ঝরে পড়ত অশ্রুধারা।

পাকিস্তান আর হিন্দুস্থানের কাহিনী শুরু হলে সে অন্য পাগলদের জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করল, টোবা টেকসিং কোথায়? সন্তোষজনক কোন উত্তর না পেয়ে তার চিন্তা দিন দিন বাড়তে লাগল। এখন আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎও হয় না। আগে নিজে থেকেই বুঝতে পারত তারা তাকে দেখতে আসছে। হৃদয় তাকে তাদের আসার খবর জানিয়ে দিত। এখন সেই হৃদয়ের আওয়াজটুকুও তার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

তার খুব ইচ্ছে করত যারা তাকে ভালোবাসত, তার জন্যে ফল-মিঠাই আর কাপড় নিয়ে আসত—তারা আসুক। সে যদি তাদের জিজ্ঞেস করত, টোবা টেকসিং কোথায় তবে তারা নিশ্চয় সত্যি কথাই বলত। সে জানতে পারত টোবা টেকসিং পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে। সে জানে যেখানে তার জমিদারী ছিল সেই টোবা টেকসিং থেকেই তারা এখানে আসত।

পাগলা গারদে আর একজন উন্মাদ ছিল সে নিজেকে খোদা বলে জাহির করত। একদিন শবন সিং তাকে জিজ্ঞেস করল, টোবা টেকসিং পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে। কিন্তু সেই খোদা তার অভ্যাস মত হো হো করে হেসে বলল, "টোবা টেকসিং পাকিস্তানেও নয়, হিন্দুস্থানেও নয়। কারণ আমি এখনও হুকুম জারী করিনি।"

শবন সিং এই খোদাকে কয়েকবার অনুনয়-বিনয় করে বলত, "তুমি হুকুম দিয়ে দাও না, তা হলেই তো ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।" কিন্তু খোদা ভীষণ ব্যস্ত ছিল, কারণ তার আরও কয়েকটি হুকুম জারী করার বাকী ছিল। একদিন শবন সিং তার ওপর ভীষণ চটে গিয়ে বলত, "ও পড় দি গিড়-গিড় দি এক্স দি বে ধ্যানা দি, মংগ দি দাল আও ওয়াহে গুরু দি খালসা এ্যাণ্ড ওয়াহে গুরুজী দি ফতহ—জো বোলো সো নিহাল সত শ্রী অকাল।"

তার এই কথার অর্থ ছিল, তুমি মুসলমানদের খোদা—তুমি যদি শিখদের খোদা হতে তবে নিশ্চয়ই আমার কথা শুনতে।

আদান-প্রদানের কয়েকদিন আগে টোবা টেকসিং-এর এক মুসলমান

বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে এল। এর আগে সে কোন দিন তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। শবন সিং তাকে দেখে একদিকে সরে দাঁড়াল এবং ফিরে যেতে লাগল। কিন্তু সিপাইরা তাকে ধরে বলল, "তোমার বন্ধু ফজলুদ্দীন।"

শবন সিং ফজলুদ্দীনকে এক নজর দেখে বিড়-বিড় করে কিছু বলতে লাগল। ফজলুদ্দীন এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি তোমার সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি, তোমার বাড়ির সবাই ভালোভাবেই হিন্দুস্থানে পৌঁছে গিয়েছে। আমার পক্ষে যতখানি সম্ভব সাহায্য করার তা করেছি। কিন্তু তোমার মেয়ে রূপ কাউর....."

বলতে বলতে ফজলুদ্দীন থেমে গেল। শবন সিং কোন কিছু চিন্তা করতে লাগল। —"আমার মেয়ে রূপ কাউর!"

ফজলুদ্দীন থেমে থেমে বলতে লাগল, "হ্যাঁ...ও—ও ঠিকঠাক আছে...ওদের সাথেই চলে গিয়েছে।"

শবন সিং চুপ করে থাকল। ফজলুদ্দীন বলতে লাগল, "ওরা আমাকে তোমার খোজ-খবর নিতে বলেছে। আমি শুনেছি তুমি হিন্দুস্থানে যাচ্ছ—ভাই বলবীর সিং এবং ভাই বধওয়া সিংহকে আমার সেলাম দিও—আর বোন অমৃত কাউরকেও। ভাই বলবীর সিংকে বলো সে যে দুটো বাদামী রঙের মেষ ছেড়ে গিয়েছে তার মধ্যে একটি মর্দা বাচ্চা দিয়েছে আর একটি মাদী বাচ্চা। কিন্তু চোদ্দ দিনের মাথায় মাদী বাচ্চাটা মরে গিয়েছে। তোমাদের জন্যে আমার কিছু করার থাকলে বলো, আমি আমার সাধ্যি মতো করব। তোমার জন্যে সামান্য মরুণ্ডে নিয়ে এসেছি।"

শবন সিং মরুণ্ডের পুটলি নিয়ে তার পাছে যে সিপাইটা দাঁড়িয়ে ছিল তার হাতে দিল। ফজলুদ্দীনকে জিজ্ঞেস করল, "টোবা টেকসিং কোথায়?" ফজলুদ্দীন আশ্চর্যের সঙ্গে বলল, কোথায়? কেন যেখানে ছিল সেখানেই আছে।"

শবন সিং আবার জিজ্ঞেস করল, "পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে?" ফজলুদ্দীন থতমত খেয়ে বলল, "হিন্দুস্থানে না পাকিস্তানে।" শবন সিং বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল—"ও প দি গিড়-গিড় দি এক্স দি বে ধ্যানা দি, মংগ দি দাল আও দি পাকিস্তান এ্যাণ্ড হিন্দুস্থান অফ্ দি দ্যুর ফিটে মুঁ।"

আদন প্রদানের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে আসা-যাওয়া···পাগলদের নামের তালিকা এসে গিয়েছিল এবং আদান প্রদানের তারিখও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যখন লাহোরের পাগলা গারদ থেকে লরি বোঝাই করে হিন্দু ও শিখ পাগলদের সীমান্তের দিকে পাঠানো হল তখন বেশী শীত পড়ে গিয়েছিল। ভারপ্রাপ্ত অফিসাররাও পাগলদের সঙ্গে ছিলেন। উভয় পক্ষের সুপারেনটেনডেণ্ট পরস্পরের সঙ্গে দেখা করলেন, এবং অফিসিয়াল কাজ কর্ম শেষ হওয়ার পর আদন প্রদান শুরু হয়ে গেল। আদন-প্রদান সমস্ত রাত্রি ধরে চলল।

পাগলদের লরি থেকে নামানো এবং অন্য অফিসারদের হেফাজতে দেওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল; অনেকে তো লরি থেকে নামতেই চাইছিল না। যারা লরি থেকে নেমেছিল তাদের সামলানো ছিল এক সাধ্যাতীত ব্যাপার। কারণ তারা এদিক ওদিক ছুটে পালাচ্ছিল। যারা একেবারে উলঙ্গ ছিল তাদের কাপড় পড়াতে গেলে তা-টেনে খুলে ফেলছিল। কেউ কেউ খিস্তি খাস্তা করছিল, কেউ বা গান গাইছিল। নিজেদের মধ্যে মারপিট ঝাগড়াঝাটিও পুরোদমে চলছিল—কান্নাকাটি করছিল। কান পেতে শোনা যাচ্ছিল না। উন্মাদ মেয়েদের গণ্ডগোল ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। সর্দি তাদের এতো বেশী ছিল যে দাঁতে দাঁত কট কট করে বাজছিল।

অধিকাংশ পাগলই এইআদান-প্রদানকে মোটেই পছন্দ করছিল না। তারা বুঝতেই পাচ্ছিল না নিজেদের জায়গা থেকে তুলে তাদের কোথায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে! যারা অল্প-বিস্তর আন্দাজ করতে পারছিল তারা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'—'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' ধ্বনি দিচ্ছিল। দু-তিন বার হাতা-হাতি হতে হতে থেমে গেল, কারণ কোন-কোন মুসলমান এবং শিখের এই ধ্বনি শুনে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে শবন সিং-এর পালা এল। তাকে তখন অন্য পারে পাঠানোর জন্য অফিসার লেখালেখি করছিলেন। তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করল, "টোবা টেকসিং কোথায়? পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে?" তার প্রশ্ন শুনে অফিসার হেসে বললেন, "পাকিস্তানে।"

অফিসারদের উত্তর শুনে শবন সিং ছিটকে সরে গেল। তার পর ছুটতে ছুটতে তার পেছনে যে সব বন্ধুরা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কাছে এসে হাজির হল। পাকিস্তানের সিপাইরা তাকে জোর করে টেনে ওপারে নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু শবন সিং এক পা-ও এগুতে চাইল না। চীৎকার করে বলতে লাগল, "টোবা টেকসিং কোথায়? —ও পড় দি গিড় গিড় দি এক্স দি বে ধ্যানা দি, মংগ দি দাল দি আও টোবা টেকসিং এ্যাণ্ড পাকিস্তান।"

তাকে খুব বোঝানো হল, "দ্যাখো, টোবা টেকসিং এখন হিন্দুস্থানে চলে গিয়েছে। যদি এখনও না গিয়ে থাকে তবে খুব তাড়াতাড়ি তাকে পাঠানো হবে।" কিন্তু সে কোন কথাই শুনল না। তাকে জোড় করে ওপারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু শবন সিং হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানের মাঝখানে একটি জায়গায় তার সোজা পা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এমনভাবে সে দাঁড়াল যেন কোন শক্তিই তাকে এখান থেকে একচুল সরাতে পারবে না। শবন সিং খুব রুগ্ন ছিল বলে কেউ আর তার উপর জবরদস্তি করল না। তাকে ঐখানে ঐভাবে ছেড়ে দিয়ে আদান-প্রদানের কাজ চলতে লাগল।

সূর্য ওঠার ঠিক আগে ঐ জায়গায় তেমনি দাঁড়িয়ে শবন সিং হঠাৎ ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠল। দুই দিককার অফিসাররা চীৎকার শুনে তার দিকে ছুটে এল। তারা দেখল, যে মানুষ দীর্ঘ পনের বছর ধরে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, সে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার পায়ের কাছে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুস্থানের পাগলরা আর মাথার দিকে সার দিয়ে পাকিস্তানের পাগলরা। আর দু'সারির মাঝখানে যে জায়গার কোন নাম নেই সেখানে পড়ে আছে টোবা টেকসিং॥

———